বাংলাপিডিএফ

১০১-১০২ দুই খণ্ড একত্রে

দস্যু জাভেদ

রোমেনা আফাজ

রুনি

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

দস্যু জাভেদ-১০১
মহাচক্র-১০২

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো জাভেদ।

আশা ওর অশ্বের লাগাম চেপে ধরে বললো—জাভেদ, তোমার বাপুর ইচ্ছা নয় তুমি তার মত হও।

আশার কথা শুনে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো জাভেদ— ঠিক বনহুরের মতই তার হাসিটা।

অবাক দৃষ্টি নিয়ে আশা তাকিয়ে রইলো জাভেদের মুখের দিকে। বনহুরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে আশা তার মধ্যে। সেই মুখচ্ছবি যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে—সেই প্রশস্ত ললাট, ঝাঁকড়া চুল, দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ-দুটি.....

জাভেদ হাসি থামিয়ে বললো—বাপুর রক্ত আছে আমার ধমনিতে, কাজেই বাপুর ইচ্ছা না থাকলেও আমি ঠিক তার মতই হবো। হাজার নিষেধ বা বাধা-বিপত্তি আমাকে ক্ষান্ত করতে পারবে না। একটু থেমে বললো জাভেদ—আশা আম্মু, তুমি যতই আমাকে সাধুবাক্য শোনাও আমি তা মানতে রাজি নই।

জাভেদ!

বলো?

আমি তোমার বাপুকে কথা দিয়েছি জাভেদকে আমি মানুষের মত মানুষ করবো কিন্তু তুমি.....

আমি কি মানুষের মত মানুষ নই আশা আম্মু?

জাভেদ, তোমাকে আমি বারবার বলেছি দস্যুতা তুমি করতে পারবে না।

কিন্তু আমি তো অন্যায়ভাবে কিছু করিনি? আজ যা দেখছো তা এক স্মাগলার দস্যুর। দস্যুকে দমন করা অসংগত কাজ নয়। স্মাগ্‌লার গাঙ্গুলাল মাইথী গোপনে কোটি টাকার মূল্যবান পাথর আপেলের মধ্যে ভরে দেশের বাইরে চালান করছিলো। আমি তা হতে দেইনি এই যা। কথা শেষ করে

পিঠে ঝোলানো ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখে বললো—আশা আম্মু, শুধু আপেলগুলোই আনিনি, তার সঙ্গে এনেছি.....এই দেখো! একটি রক্তমাখা দ্বিখন্ডিত মাথা ব্যাগ থেকে বের করে তুলে ধরলো আশার সম্মুখে।

আশা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

জাভেদ অট্টহাসি হেসে উঠলো।

আশা চোখ থেকে ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিয়ে অধর দংশন করে বললো—জাভেদ, এই তোমার কাজ!

হাঁ।

জাভেদ!

আমি বাপুর চেয়েও দুর্ধর্ষ হবো তুমি দেখে নিও.....

জাভেদ, তুমি এতো ভয়ংকর হবে তা ভাবতে পারিনি। তোমার কাজে আমি দুঃখিত.....

জাভেদ হেসে বললো—আশা আম্মু, আমিও কম দুঃখিত নই তুমি যদি আমার কাজে বাধা দাও। কথাটা বলে গাঙ্গুলাল মাইথীর মাথাটা ছুড়ে ফেলে দিলো দূরে। তারপর বললো—বাপু, আমার কাজে সন্তুষ্ট হবেন না জেনে আমি সরে এসেছি তোমার পাশে। তুমি যদি বাধা দাও তাহলে আমি—

জাভেদ, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি বলো আমার কথা মানবে কিনা?

আমি তোমার সবকথা মানবো কিন্তু আমার কাজে তুমি বাধা দিও না আম্মু।

আশা ছুটে চলে যায় কুটিরের মধ্যে। বিছানায় উবু হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। বনহুরকে কথা দিয়েছিলো জাভেদকে আশা অন্যরকম করে গড়ে তুলবে। সে হবে একজন স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ কিন্তু তার সে কথা রইলো না। কি করে মুখ দেখাবে সে বনহুরকে। অসুস্থ বনহুরকে সে রেখে এসেছে কান্দাই আস্তানায়। কত আশা ভরসা তার বুকে। নূর যেমন লেখাপড়া শিখে একজন শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ হয়েছে তেমনি জাভেদও হবে একজন শিক্ষিত নাগরিক। কিন্তু জাভেদ লেখাপড়া তেমন

করলো না। বনহুর দস্যু হলেও সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত; সর্বরকম প্রকৌশলী বিদ্যা রয়েছে তার মধ্যে। কেউ কোনোদিন তাকে শিক্ষার দিক দিয়ে পরাজিত করতে পারেনি। আর তারই সন্তান জাভেদ কিনা অমানুষ।

জাভেদ দরজায় দাঁড়িয়ে বলে—আশা আম্মু, আপেলগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে গেলাম।

আশা চোখ তুলবার পূর্বেই কুটির হতে বেরিয়ে গেছে জাভেদ।

দরজায় এসে দাঁড়ালো আশা। জাভেদ তখন অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেছে।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

জাভেদ তার অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতেই অশ্বটি সম্মুখের দু'পা তুলে চিঁহিঁ চিঁহিঁ শব্দ করে উঠলো, তারপর ঝড়ের বেগে উধাও হলো।

অশ্বপদশব্দ ভেসে আসছে আশার কানে।

জাভেদ আজ পূর্বের সেই শিশুটি নেই; সে অনেক বড় হয়েছে। বুঝতে শিখেছে সে। বাপুর ইচ্ছা সে জানে তবু সে নিজেকে সংযত করতে পারবে না।

বনহুর একদিন বলেছিলো তার ছেলে তারই মত হবে, কারণ তার দেহের রক্ত আছে জাভেদের দেহে কিন্তু বুঝেও সে না বোঝার ভান করেছে জেনেও না জানার অভিনয় করেছে। জাভেদকে বনহুর তার মত না হবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রচেষ্টা তার সফল হবে না, এটাও জানতো বনহুর তবু সে আশার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলো যেন ওকে সে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলে।

আশা ফিরে আসে বিছানায়।

একটা অশান্তির ছায়া ঘনীভূত হয়ে পড়ে তার মনে, বড় হয়ে জাভেদ নিজমূর্তি ধারণ করেছে। ওকে আর কেউ রুখতে পারবে না।

অনেক ভেবেও যখন আশা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না তখন শয্যা ত্যাগ করে ফিরে এলো তার অশ্বপাশে। কোথায় গেলো জাভেদ দেখবে সে।

আশা অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো, তারপর উল্কাবেগে অশ্ব নিয়ে অগ্রসর হলো যে পথে জাভেদ গিয়েছে সেই পথে।

জাভেদের অশ্বপদ শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিলো। আশা সেই শব্দ লক্ষ্য করে নিজ অশ্বকে চালনা করলো।

জাভেদ সবার অগোচরে হীরা পর্বতের গোপন এক স্থানে আস্তানা গড়ে তুলেছিলো। সেখানে সে একা, কেউ তার সঙ্গী বা অনুচর ছিলো না। তার নিজ আস্তানার এক অধিনায়ক সে।

জাভেদ বুঝতে পেরেছিলো আশা তাকে অনুসরণ করবে এবং তার কাজে বাধা দেবে, তাই আশার দৃষ্টি এড়িয়ে নানা পথে সে এক সময় তার সেই গোপন গুহায় এসে পৌছলো।

আশা তার পেছনে ধাওয়া করেও তাকে ধরতে পারলো না।

জাভেদ ততক্ষণে তার গোপন গুহায় পৌছে গেছে। অশ্বটিকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে জাভেদ প্রবেশ করলো তার গুহায়।

নির্জন গুহা।

ছোট্ট বা ক্ষুদ্র নয়—বিরাট গুহা।

গুহাটা পর্বতমালার মাঝামাঝি একটি পর্বতের আড়ালে অথচ পৃথিবীর আলো-বাতাস প্রবেশে বাধা নেই। গুহাটা জাভেদের ভারী পছন্দ।

এ গুহাটার সন্ধান কেউ কোনোদিন পাবে না। অত্যন্ত গোপন স্থানে সংরক্ষিত এক সৈন্যশিবির যেন জাভেদ তার অশ্বটিকে অদূরে এক গাছের গোড়ায় বেঁধে গুহায় প্রবেশ করলো।

পিঠ থেকে আপেলের বোঝাটা খুলে নিয়ে নামিয়ে রাখলো গুহার মেঝেতে, তারপর বসলো সে একটা পাথরাসনে। ঝুঁকে পড়ে একটা আপেল তুলে নিলো হাতে, তারপর আপেলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আপন মনে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ কি সুন্দর আপেলটা। এমনি সবগুলো আপেল কিন্তু তার ভিতরে যা আছে তা আরও সুন্দর এবং মূল্যবান।

জাভেদ প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে একটা আপেল কেটে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো একটি উজ্জ্বল দীপ্ত পাথর। মূল্যবান হীরকখন্ডটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো জাভেদ। চোখ দুটো তার জ্বলছে যেন।

একটি একটি করে সবগুলো আপেল কেটে বের করলো হীরাগুলো তারপর রুমালে মুছে পরিষ্কার করে নিলো। সাজিয়ে রাখলো সম্মুখস্থ একটা পাথরের উপর।

অন্ধকার গুহাটার মধ্যে উজ্জ্বল হীরাগুলো ঝকমক করতে লাগলো। আনন্দে জাভেদের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। জীবনে এই তার প্রথম জয়লাভ।

মূল্যবান হীরাগুলো পাচার করে দেওয়া হচ্ছিলো দেশের বাইরে। স্মাগলার দলকে জাভেদ পাকড়াও করেছে এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে যার জন্য ওরা হারিয়েছে ওদের মূল্যবান সম্পদ হীরাগুলো।

আশা তার অশ্ব নিয়ে বহু সন্ধান করেও পেলো না জাভেদকে। সুচতুরা আশার চোখে সে ধূলো দিয়ে গোপন স্থান বেছে নিয়েছে তার আস্তানার জন্য।

ফিরে আসে আশা বিফল মনোরথ হয়ে।

মন তার বিষণ্নতায় ভরে উঠেছে।

অনেক আশা-ভরসা ছিলো তার জাভেদের উপর। জাভেদকে সে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলবে.....কিন্তু সে তার সব আশা-বাসনা চূর্ণ করে দিলো। জাভেদ নরহত্যা করতেও পিছপা হয়নি। বনহুরকে আশা কথা দিয়েছিলো জাভেদকে সে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবে। আশা তার ছোট্ট কুটিরের মেঝেতে পায়চারী করতে থাকে। তার ভারী বুটের শব্দের প্রতিধ্বনি হতে থাকে নিস্তব্ধ কুটিরের মাঝে।

❑

চমকে উঠলো মনিরা।

মেঝেতে ভারী বুটের শব্দ কানে ভেসে এলো তার। এ শব্দ তার অতি পরিচিত, আনন্দে দুলে উঠলো মনিরার হৃদয়। সে ছাড়া কেউ নয়...মনিরা অন্ধকারে চোখ মেলে তাকালো।

ভারী বুটের শব্দ তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে।

বুকটা টিপ টিপ করছে মনিরার।

তবে কি সত্যি সে এসেছে?

বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো কেউ।

মনিরার নিঃশ্বাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে একজনের। যাকে সে কামনা করে এসেছে দিনের পর দিন—তার স্বামী।

বিছানার পাশে বসে পড়লো কেউ, তারপর একটি শান্ত চাপা কণ্ঠস্বর মনিরা।

মনিরা নিশ্চুপ, কোনো জবাব সে দিলো না।

এ কণ্ঠস্বর সে বহুদিন শোনেনি, আজ তার মন উচ্ছল আনন্দে নেচে উঠলো যেন।

আবার সেই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি—মনিরা, আমি এসেছি...মনিরা, কত ঘুমাও?

এবার মনিরা নিশ্চুপ থাকতে পারলো না, বললো—তুমি এত নিষ্ঠুর।

এ তো পুরানো কথা মনিরা, নতুন কথা কিছু বলো? বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো।

মনিরা ততক্ষণে শয্যায় উঠে বসেছে।

তার মুখমন্ডল অভিমানে রাঙা হলেও অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিলো না। তবু বনহুর অনুভব করছিলো মনিরা তার উপর ক্ষুণ্ন হয়েছে। আর নিজকে সে এ কারণে অপরাধী মনে করছিলো।

বললো মনিরা—নতুন কথা শুনতে চাও?

হাঁ বলো, তাই বলো মনিরা? নতুন কিছু শুনতে চাই তোমার মুখে।

শোন তাহলে—তোমার পুত্র এখন আর ছোট্টটি নেই।

জানি মনিরা সে এখন শুধু বয়সে বড় হয়নি, সে এখন কান্দাইয়ের প্রখ্যাত ডিটেকটিভ—

শুধু তাই নয়, সে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য উদগ্রীব এবং আমার যতদূর মনে হয় সে সফল হবে।

মনিরা তুমি...

হাঁ আমি আর তার সঙ্গে লুকোচুরি করতে পারবো না। কারণ সে এখন আমার চেয়ে অনেক বেশিজ্ঞানী বুদ্ধিমান হয়েছে। কথা বলতে গেলেই ভয় হয় কখন বুঝি ওর কাছে আমার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়। জানো সে সর্বক্ষণ দস্যু বনহুরকে খুঁজে ফিরছে।

জানি!

আর কতদিন এমনি চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে?

মনিরা, বার বার তুমি আমাকে এ কথা বলে দুঃখ দাও। তুমি তো সব জানো, নতুন করে বলবার কিছু নেই। কথাটা শেষ করেই বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে, গভীর আবেগে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—মনিরা, চোরের মত পালিয়ে আসি তবু তুমি আমাকে কোনোদিন অবহেলা করে ফিরিয়ে দাওনি...

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিতে পারে না। বরং সে আবেগে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে চোখ দুটো বন্ধ করে।

অনাবিল শান্তিতে ভরে উঠে মনিরার হৃদয়।

ভাবে মনিরা, যে বনহুরকে পাবার জন্য লালায়িত কত শত শত নারী, আর সেই বনহুর তার স্বামী—ক'দিন আগের কথা মনে পড়ে মনিরার, বান্ধবী সুফিয়ার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কোনো এক বিয়ে বাড়িতে। কোনো এক কথায় বনহুরের কথা উঠে মহিলা মহলে। মনিরা নিশ্চুপ শুনে যায়, তার কান সজাগ ছিলো এ ব্যাপারে।

বললো সুফিয়া—দস্যু বনহুরকে আমি চিনি, আমি তাকে দেখেছি। সে এক অপূর্ব মহাপুরুষ।

বলছিলো মাধবী সেন—দস্যু বনহুর শুধু দেবপুরুষ নয়, তার সৌন্দর্য সবাইকে অভিভূত করে।

আরিফা উচ্ছল কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তোলে—যে কোনো নারী তাকে না ভালবেসে পারে না, শুনেছি তাকে পাবার জন্য বহু নারী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে।

মালতী দেবী বলেছিলো—বনহুরকে একটিবার যদি দেখতাম তবু জীবন সার্থক হতো, সে নাকি অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর।

সুফিয়া জবাব দিয়েছিলো—আমি তাকে দেখেছি, কোনোদিন তাকে ভুলবো না। সে শুধু সুন্দর নয় তার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর একবার যার কানে প্রবেশ করেছে সে কোনো দিন তার সেই কণ্ঠস্বর বিস্মৃত হবে না। তারপর আপন মনেই বলেছিলো সে—আমি তাকে যে বেশে দেখে ছিলাম তা চিরদিন স্মরণ থাকবে।

মনিরার মনে প্রশ্ন জেগেছিলো তাই সে চুপ থাকতে পারেনি, বলেই বসেছিলো মনিরা—সুফিয়া, তুমি তাকে দেখেছো?

অনাবিল এক আনন্দ ঝরে পড়েছিলো সুফিয়ার চোখেমুখে। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে মনে মনে স্মৃতিমন্থন করছিলো সে, তারপর বলেছিলো —দেখেছি, সে এক দীপ্তিময় পুরুষ যার সঙ্গে আর কোনো পুরুষের তুলনা হয় না।...বলতে বলতে আনমনা হয়ে পড়েছিলো সুফিয়া।

বনহুর সম্বন্ধে আলোচনায় সবাই যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো সেদিন, এমন কি রশিদা বেগম বৃদ্ধা তিনিও বনহুরের নামে পুত্রসুলভ স্নেহভরা কণ্ঠে বলেছিলেন—বনহুর শুধু সুদর্শন পুরুষই নয়, সে গরিব অসহায় দুঃস্থ মানুষের বন্ধু...আরও বলেছিলেন তিনি—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ মহল ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেড়ালেও তারা কোনো দিন তাকে কাবু করতে পারবে না, কারণ তার উপর রয়েছে হাজার নর-নারীর এবং অসহায় মানুষের দোয়া...

মনিরার গন্ড বেয়ে সেদিন গড়িয়ে পড়েছিলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে সে মুখ ফিরিয়ে আড়ালে চোখ মুছে নিয়েছিলো।

বনহুর বলে উঠলো—কি ভাবছো মনিরা?

মনিরা নিশ্চুপ।

বনহুর ওর গন্ড স্পর্শ করে চমকে উঠে বলে—তুমি কাঁদছো মনিরা। কথাটা বলে বনহুর সুইচ টিপে আলো জ্বালতে যায়।

মনিরা বলে উঠে—থাক, আলো না জ্বালাই ভাল।

বলে বনহুর—কতদিন তোমার মুখ দেখিনি মনিরা। একটু দেখতে দাও।

না থাক।

বনহুর ফিরে আসে মনিরার পাশে। চিবুকটা তুলে ধরে গণ্ডে হাত বুলিয়ে বলে—হঠাৎ চোখে পানি কেন মনিরা?

জানি না।

বুঝেছি তুমি আমার উপর অভিমান করেছো?

না গো না।

তবে কথা বলছো না কেন?

ভাবছি অনেক কথা।

বলবে না মনিরা?

বলবো কিন্তু আজ নয়।

কি এমন কথা যা আমাকে নিশ্চুপ করে দিয়েছে?

ওগো সে তোমারই কথা।

আমার কথা?

হাঁ।

মনিরা, তুমি সব সময় আমার কথা ভাবো? একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—জানি না কেন তুমি সর্বক্ষণ আমার কথা চিন্তা করো।

তুমি বুঝবে না স্বামী নারীর কতবড় জিনিস....

তাই বলে তুমি...

তোমার কথা ভেবে আমি যে পরম শান্তি পাই।

মনিরা।

বলো?

কত পবিত্র তুমি! তোমাকে স্পর্শ করতে আমার ভয় হয়।

ওগো এ তুমি কি বলছো?

সত্য মনিরা। তুমি ফুলের মত পবিত্র, তুমি চাঁদের আলোর মত নির্মম স্বচ্ছ, তাই...

তুমিও তো...

আমি এক হতভাগা—পাপী অপরাধী...

তুমি হতভাগা পাপী অপরাধী এ কথা তুমি ভাবলেও আমরা সবাই জানি তুমি কত মহান কত মহৎ কত পবিত্র...

মনিরা, তাই যদি ভাবো তাহলে আমার কোনো দুঃখ-ব্যথা নেই। মনিরা..গভীর আবেগে বনহুর মনিরাকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়।

মুক্ত জানালার ফাঁকে নিশীথ রাতের দমকা হাওয়া প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ে বনহুর আর মনিরার শরীরে।

বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে মনিরা—এবার সংসারী হও।

সংসারী হবার বড় সাধ হয় কিন্তু উপায় নেই মনিরা।

কেন?

তুমি নিজের মনকে প্রশ্ন করো। একটু থেমে বললো বনহুর—তোমার সন্তান সেই তো আমাকে ক্ষমা করবে না মনিরা।

কিন্তু...

কোনো কিন্তু নেই। আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না।

তুমি জানো না নারী-পুরুষ সবাই তোমাকে কত ভালোবাসে।

হয়তো অনেকে বাসে তবে বেশির ভাগ মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। পুলিশমহল তো আমাকে আটক করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই সংসারী হব চাইলেও সংসার আমাকে গ্রহণ করবে না মনিরা।

তুমি কি চিরদিন এমনি করে লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপন করে...

হাঁ, এ ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। বনহুর এমনভাবে কথাটা বললো যে মনিরা কোনো জবাব বা প্রশ্ন খুঁজে পেলো না। স্বামীর চুলের ফাঁকে নীরবে আংগুল বুলিয়ে চললো।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটার পর বললো বনহুর—জানো না মনিরা আজ পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে কি ভাবে এখানে এসেছি।

আমার কিন্তু ভয় করছে।

ভয়! কিন্তু ভয় করে লাভ কি মনিরা। পুলিশ মহল শুধু আজ নয়, দীর্ঘদিন এমনভাবে চৌধুরীবাড়ির দিকে শ্যেন দৃষ্টি রেখে আসছে।

ওগো শুনেছি মিঃ জাফরী তোমার বন্ধু বনে গেছেন?

হাঁ।

এমনি করে পুলিশমহলকে তুমি বন্ধু বানিয়ে নিতে পারোনা?

তোমার সন্তান নূর যদি আমাকে সচ্ছভাবে পিতা বলে গ্রহণ করে নিতে পারতো তাহলে পুলিশমহল.....কথা শেষ না করেই থেমে যায় বনহুর, বলে উঠে—জানি তা কোনোদিন সম্ভব নয়। মনিরা, ভোর হয়ে আসছে, এবার আমাকে বিদায় দাও? বলে বিছানায় উঠে বসে বনহুর।

মনিরা স্বামীর জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলে—বিদায় নয় বলো আসবে?

নিশ্চয় আসবো। বনহুর এবার শয্যা ত্যাগ করে এগিয়ে যায় মুক্ত জানালার দিকে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে নেমে পড়ে সে।

পাইপ বেয়ে কিছুটা নামতেই শোনা যায় গুলীর শব্দ।

শিউরে উঠে মনিরা। বুকটা তার কেঁপে উঠে থর থর করে। তবে কি পুলিশমহল টের পেয়ে গেছে!

পর পর আবার কয়েকটা গুলীর শব্দ হলো।

সিঁড়িতে শোনা গেলো বুটের শব্দ।

একটু পরই দরজায় ধাক্কার শব্দ, পরক্ষণেই নূরের গলা শোনা গেলো আম্মু..দরজা খোলো আম্মু।

মনিরা চমকে উঠলো। তাহলে কি নূর এসেছে বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশমহলকে নিয়ে।

মনিরা দরজা খুলে দিলো, চোখেমুখে তার উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠেছে।

দরজা খুলতেই নূর ব্যস্তকণ্ঠে বললো—আম্মু, দস্যু বনহুর আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিলো না জানি কোন্ সর্বনাশ সে করে গেছে।

মনিরা নিশ্চুপ, কোনো কথা সে বললো না।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন, নিদ্রাজড়িত চোখে রাশিকৃত বিস্ময় ঝরে পড়ছে। চাকর বাকর তারাও এসে দাঁড়িয়েছে। সবার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।

মনিরার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো নূর—আম্মু, দস্যু বনহুর আমাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। দেখো তোমার হীরার হার সে নিয়ে গেছে কিনা?

মনিরা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নূর বলে কথা বলছোনা কেন আম্মু? বুঝেছি তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছো। দাদী আম্মু, আম্মুকে তুমি দেখো, আমি দেখছি সে কিছু নিয়ে গেছে কিনা?

নূর দ্রুত এগিয়ে যায় আলমারীর দিকে, ড্রয়ার খুলে চাবি নিয়ে আলমারী খুলে ফেলে। নূর জানে তার মায়ের একটা মূল্যবান হীরার হার আছে যা তার আব্বু তার মাকে দিয়েছিলেন। নূর নিজ চোখে সেই হীরার হার দেখছে যা সাত রাজার ধন—আলমারী খুলে হীরার হারের গোপন ড্রয়ার খুলে কৌটা বের করে মেলে ধরে চোখের সামনে। কৌটার মধ্যে হীরার হার তেমনিই রয়েছে যেমনটি রাখা হয়েছিলো।

নূর হীরার কৌটা ঠিক্ জায়গায় রেখে ফিরে আসে মায়ের পাশে, কতকটা আশ্বস্ত কণ্ঠে বলে—আম্মু, দস্যু বনহুর তোমার হীরার হার নিতে পারেনি। যেমন ছিলো তেমনটিই আছে। আমি নিচে গিয়ে দেখি পুলিশ মহল দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো কিনা কথা শেষ করেই নূর নেমে যায় নিচে।

মরিয়ম বেগম যেন সব বুঝতে সক্ষম হলেন, তিনি ডেকে উঠলেন— নূর, ওরে শোন্...ওরে শোন্...

ততক্ষণে নূর নিচে নেমে গেছে।

এখনও চৌধুরীবাড়ির বাগান বাড়ির আশপাশ থেকে শব্দ ভেসে আসছে।

মনিরার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, জানি না সে আহত অথবা নিহত কিছু হয়নি তো? মনিরার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু?

মরিয়ম বেগম ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন পুত্রবধূর পাশে, উৎকুণ্ঠাভরা কণ্ঠে বলে—ও কি এসেছিলো বৌমা?

হাঁ, এসেছিলো। বললো মনিরা।

তাহলে আমার মনির, এসেছিলো? সর্বনাশ, ওকে পুলিশে হত্যা করেছে। ওকে হত্যা করেছে...দেখছোনা গুলীর শব্দ হচ্ছে...

মামীমা, তুমি চুপ করে থাকো, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি চুপ করো মামীমা।

না না, আমি চুপ করে থাকতে পারবো না। আমি চুপ করে থাকতে পারবো না। নূরকে আমি সব খুলে বলবো।

মামীমা, ধৈর্য ধরো। ভুল করোনা, এমন ভুল করলে তা কোনোদিন সংশোধন হবে না। নূর সব জানতে পারবে। কথাগুলো মনিরা অত্যন্ত চাপাকণ্ঠে বললো। কেউ যেন তার কথা শুনতে না পায়।

হঠাৎ মনিরা এবং অন্যান্য সবার কানে প্রবেশ করে অশ্ব পদশব্দ। দূরে অনেক দূরে কেউ যেন ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে চলে যায়।

এবার মনিরার মুখমন্ডল শান্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠে। কারণ সে বুঝতে পারে তার স্বামী নিহত হয়নি, জীবিত আছে এবং সে তার অশ্ব নিয়ে চলে যেতে পেরেছে।

❑

মায়ের শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলে নূর—আম্মু, একটা সুযোগ আমি হারালাম, বড় আফসোস হচ্ছে দস্যু বনহুরকে আয়ত্তে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম না।

মনিরা আলনায় কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখছিলো, পুত্রের কথায় বললো সে—দস্যু বনহুর আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি তবু কেন তাকে গ্রেপ্তারে তোমার এত আগ্রহ বলো তো নূর?

আম্মু, তুমি হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন করে বসবে ভাবতে পারেনি। দস্যু বনহুর আমাদের কোনো ক্ষতি না করলেও সে জনগণের সর্বনাশ করেছে এবং করছে। আম্মু, আজ না হলেও একদিন না একদিন আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবোই। আম্মু, তুমি দোয়া করো যেন আমি সফলকাম হই।

এমন সময় মরিয়ম বেগম সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বললেন—মা-ছেলে মিলে কি গল্প হচ্ছে শুনি?

মরিয়ম বেগমের কথায় মনিরা কোনো জবাব দিলো না।

নূর শয্যায় উঠে বসে বললো—দাদী আম্মু, এসো এবার তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলি। হয়তো আর সময় হবে না, কারণ এখন বিদায় নেবো।

ও কথা বলতে নেই দাদু! বললেন মরিয়ম বেগম।

কেন বলতে নেই? বললো নূর।

বলো আসবো।

মরিয়ম বেগমের কথায় হেসে উঠলো নূর। তারপর বললো—আবার আসবো এ সান্ত্বনা নিয়েই তাহলে বিদায় নিতে হচ্ছে এখন।

আচ্ছা নূর?

বলো দাদী আম্মু?

এত বড় ডিটেকটিভ হয়েছিস শুধু কি ঐ দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করবার জন্য না তোর আরও কাজ আছে? যেমন ধর্ চোর গুন্ডা বদমাইস, পাগলার খুনী এমনি কত প্রকার দেশের শত্রু আছে।

হেসে বলে নূর—এ সবকে পাকড়াও করবার জন্য আছে পুলিশ মহল।

আর তুই বুঝি শুধু...

হাঁ দাদী আম্মু, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়াই আমার প্রধান উদ্দেশ্য তবে চোর গুণ্ডা বদমাইশ যারা দেশের ও দশের শত্রু তাদেরকেও আমি খুঁজে বের করতে পিছপা হবো না। দাদী আম্মু, দস্যু বনহুরকে তুমি জানো না, তাকে পুলিশমহল গ্রেপ্তার করেও আটক রাখতে পারেনি, এমনকি মিঃ জাফরীর মত পুলিশ সুপারকেও সে হিমসিম খাইয়ে ছেড়েছে।

আচ্ছা, নূর, মিঃ জাফরী নাকি দস্যু বনহুরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন?

হাঁ দাদী আম্মু, মিঃ জাফরীকে কোনো এক বিপদ মুহূর্তে সহায়তা করেছে সে, তাই মিঃ জাফরী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে বিরত আছেন।

মনিরা আলনায় কাপড় গুছিয়ে রাখছিলো, সে হাতের কাজ শেষ করে শাশুড়ি এবং পুত্রের পাশে এসে দাঁড়ালো।

নূর বললো—আম্মু, তুমিও বুঝি এলে দস্যু বনহুরকে নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে?

না।

তবে তোমার মুখ দেখে কিন্তু আমি আন্দাজ করে নিয়েছি তুমি কিছু বলবে।

হাঁ, বলবো বলেই তো এগিয়ে এলাম।

বলো?

নূর, তুমি জানো না দস্যু বনহুর কত মহৎ। জানলে তার পিছু লাগতে না।

আম্মু, তুমি যতটুকু তার সম্বন্ধে জানো তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি জানি বা জানতে পেরেছি...

চুপ করো নূর, আর শুনতে চাই না। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো মনিরা।

নূর কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো—দাদী আম্মু, আমি ঠিক বুঝতে পারি না আম্মু দস্যু বনহুর সম্বন্ধে কথা উঠলে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়েন।

যাক্ ওসব কথা!

না দাদী আম্মু, তোমরা দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ না জুগিয়ে শুধু নিরুৎসাহ করো। জানোনা দাদী আম্মু, দস্যু বনহুরকে যদি আমি গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই তাহলে আমার সাধনা সার্থক হবে, আমি জয়যুক্ত হবো।

মরিয়ম বেগম অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—নূর!

হাঁ দাদী আম্মু, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে আমি স্বনামধন্য ডিটেকটিভ হতে চাই।

নূর, তুই ভুল করবি। যে ভুলের কোনো সমাধান খুঁজে পাবি না। তুই জানিস না সে—

মনিরা ঐ মুহূর্তে ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করে। সে কক্ষ হতে বাইরে গেলেও দরজার ওপাশে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে পুত্র ও শাশুড়ির কথা শুনছিলো। সে মুহূর্তে মরিয়ম বেগম বললেন নূর তুই ভুল করবি—যে ভুলের কোনো সমাধান খুঁজে পাবি না—না জানি এর পর কি বলে বসবেন কে জানে, তাই মনিরা দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে বললো মামীমা, নূরকে যেতে দাও। ওর অনেক কাজ আছে।

নূর বলে উঠলো—আম্মু, তুমি ঠিক বলেছো, অনেক কাজ আছে, এবার তাহলে আসি।

মরিয়ম বেগম বললেন—দাদু আবার কিন্তু এসো।

আসবো। কথাটা বলে উঠে পড়লো নূর।

মরিয়ম বেগম তাকে সিড়ির মুখ অবধি এগিয়ে দিলেন।

মনিরা ইচ্ছা করেই সরে রইলো ঐ সময়। কারণ তার মনটা বড় অপ্রসন্ন ছিলো, নূরের কথাগুলো তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। নূর যতদিন ছোট ছিলো তখন সে যা কিছু বলুক সহ্য হতো এখন মনিরা কিছুতেই যেন নূরের উক্তিগুলোকে বরদাস্ত করতে পারছিলো না। কেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার ছাড়া তার কি আর অন্য চিন্তা থাকতে পারে না? দস্যু বনহুর ছাড়া আরও অনেক দুস্কৃতিকারী রয়েছে যারা জনগণের ক্ষতি সাধন করে চলেছে।

মনিরার মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়, স্বামীর চিন্তায় সে অস্থির হয়ে পড়ে, তার কোনো ক্ষতি হয়নি তো—

মনিরা আনমনে দাঁড়িয়ে ছিলো জানালার ধারে।

মরিয়ম বেগম তার পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

বললেন—বৌমা!

চমকে উঠে ফিরে তাকালো মনিরা।

মরিয়ম বেগম বুঝতে পারলেন মনিরার মনে একটা গভীর চিন্তার ছাপ পড়েছে। একদিকে স্বামী অপর দিকে সন্তান, কি করবে সে, কোন্ দিকে যাবে। স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম বৌমা, ভেবে আর কি হবে, ভাগ্যে যা ছিলো তাই ঘটছে। ভাগ্যকে পরিহার করার মত আমাদের কোনো শক্তি নেই।

মনিরা আঁচলে চোখ মুছে বললো—জানি মামীমা, তবু মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। স্বামী সন্তান কেউ আমার ব্যথা বুঝলো না।

জীবনভর শুধু চোখের পানিই ফেললি মনিরা। মন খুলে হাসতে দেখলাম না কোনোদিন। বড় হতভাগী তুই, তাই চোখের পানি তোর নিত্য সাথী।

মনিরার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো, সে কোনো কথা বলতে পারলো না, জড়িয়ে ধরলো মরিয়ম বেগমকে, উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

সরকার সাহেব এসে দাঁড়ালেন, বললে তিনি—কেঁদে কি হবে বৌমা? জীবনটা একটা মেশিনের মত—তাকে চলতেই হবে, না চলে যে কোনো উপায় নেই মা।

মরিয়ম বেগম পুত্রবধূর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে সরকার সাহেবের কথায় যোগ দিয়ে বললেন—ঠিকই বলেছেন জীবনটা একটা যন্ত্র বা মেশিনের মত। ইচ্ছে না থাকলেও চলতে হবে। প্রতি দিনের নিয়ম মতই কাজ করে যেতে হবে। তুই তো জানিস বৌমা, কত ব্যথা কত যন্ত্রণা বুকে চেপে আমি সোজা হয়ে পথে চলছি। লোকে বলে আমি কত সুখী—কোনো

অভাব-অভিযোগ আমার নেই। কিন্তু তারা জানে না ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে মানুষের মনের অভাব পূরণ হয় না।

সরকার সাহেবের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো, তিনি রুমালে চোখ মুছে বললেন—বেগম সাহেবা যা বললেন তা সত্যি—ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য মানুষের দৈহিক অভাব পূরণ করতে পারে কিন্তু মনের অভাব পূরণ করতে পারে না। বেগম সাহেবা, আপনি বেশি চিন্তা করলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। এবার যেন একটু অন্য চিন্তায় মন দিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন মরিয়ম বেগম।

সরকার সাহেব নিজ কাজে চলে গেলেন।

মনিরা আঁচলে চোখের পানি মুছে ফেললো।

❑

বনহুর আস্তানায় প্রবেশ করতেই রহমান মশাল হাতে এসে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—সর্দার! আপনি আহত।

মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলো বনহুরের জামার বামপাশের জামাটা রক্তে জব্ জব্ করছে। চুলগুলো এলোমেলো।

রহমান তার দক্ষিণ হাতে মশাল ধরে আছে, সে সর্দারকে ধরতে পারছে না।

ততক্ষণে কায়েস আর হারুন এসে দাঁড়ালো।

রহমান ইংগিত করতেই কায়েস ও হারুন ধরে ফেললো বনহুরকে এবং তাকে নিয়ে চললো আস্তানার ভিতরে।

নূরীর দরজায় পৌঁছতেই নূরী আর্তনাদ করে উঠলো—তোমার এ অবস্থা কেনো?

বনহুরকে সে ধরে শয্যায় শুইয়ে দিলো।

পাশে বসে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো কি করে এমন অবস্থা হলো তোমার বলো?

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে চোখ বুঁজে রইলো।

বনহুরের শিয়রে দাঁড়িয়ে রহমান, কায়েস এবং হারুন।

রহমানের হাতে মশাল তখনও ধরা রয়েছে।

সবার চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তারা সর্দারের জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

নূরী বারবার বনহুরের গন্ডদেশে এবং চিবুকে হাত বুলিয়ে বলছে—কথা বলছো না কেন হুর? কেমন করে এমন অবস্থা হলো?

বনহুর বললো—পুলিশের গুলী আমার বাম পাজরের পাশের চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে গেছে তাই প্রচুর রক্ত ক্ষয় হচ্ছে। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এক্ষুণি সেরে উঠবো।

রহমান বললো—ডাক্তার আনতে হবে সর্দার?

বনহুর বললো—না, ডাক্তার লাগবে না।

নূরী বললো—ডাক্তার লাগবে। যাও রহমান ভাই।

এমন সময় ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো সর্দার...তোমার একি হয়েছে? একি হয়েছে...আঁচলে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ফুল্লরা সর্দারকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। সে যদি সেদিন তাকে উদ্ধার না করতো তাহলে আজ ফুল্লরা নিজকে হারিয়ে ফেলতো চিরদিনের জন্য। কোনোদিন হয়তো ফিরে আসতে পারতো না তার মা-বাবার পাশে।

সর্দারের প্রতি ফুল্লরার আন্তরিক দরদ রয়েছে, তাই সে বনহুরের অবস্থা দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, নিজকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারলো না, উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর ওকে ডাকলো এসো, আমার পাশে এসো ফুল্লরা।

ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে।

বনহুর সস্নেহে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললো—ফুল্লরা, আমার জন্য তুমি কাঁদছো? কিন্তু আমার তো কিছু হয়নি। এই তো সেরে উঠবো এখন।

ওকি তবু চোখে পানি? ছিঃ কাঁদতে নেই...ফুল্লরার চোখের পানি বনহুরকে ব্যথিত করে তুললো, তার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

বনহুরের আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও বেশ কিছুদিন তাকে শয্যা ত্যাগ করতে দিলো না নূরী। সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে তাকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রইলো।

ফুল্লরা সেবা করতো সর্দারের।

একদিন সে সর্দারকে জিজ্ঞাসা করে বসলো—সর্দার, সত্যি করে একটা কথা তুমি আমাকে বলবে?

হেসে বললো বনহুর—বলো বলবো।

ফুল্লরা বনহুরের মুখে স্থিরদৃষ্টি রেখে বললো—ঠিক করে বলবে এ আঘাত তোমাকে কে করেছে?

বনহুর গম্ভীর হয়ে বললো এ প্রশ্ন ছাড়া তুমি অন্য যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো ফুল্লরা, আমি সঠিক জবাব দেবো।

সর্দার, আমি জানি তুমি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলোনা, তাই আমার বিশ্বাস আজ আমি যে প্রশ্ন করেছি তার সঠিক জবাব দেবে।

ফুল্লরা বেশ ভারী গলায় সর্দারকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললো।

এবার বনহুর ওকে টেনে নিলো কাছে, স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বললো—ফুল্লরা, এই আঘাত আমি পেয়েছি পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে।

পুলিশ বাহিনী তোমাকে আঘাত করলো আর তুমি তা নীরবে সহ্য করলে? সর্দার, পুলিশ বাহিনীর এই আঘাত তুমি কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। এর প্রতিশোধ তোমাকে নিতেই হবে।

হাসলো বনহুর।

ফুল্লরা অভিমানভরা কণ্ঠে বললো—এতবড় আঘাত তুমি পেলে অথচ...

এমন সময় ভারী বুটের শব্দে সবাই চমকে ফিরে তাকালো।

নূরী আনন্দে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠলো—জাভেদ তুই এসেছিস বাবা?

জাভেদ মায়ের মুখে দৃষ্টি রেখে বললো—হাঁ আম্মি, আমি এলাম। বাপু নাকি ভীষণ আহত হয়েছেন, এ কথা জানতে পেরে—

ফুল্লরা তাড়িতাড়ি সরে দাঁড়ালো একটু দূরে। তার চোখেমুখে আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। জাভেদকে সে কতদিন দেখেনি। ওর মনটা খুব উদগ্রীব ছিলো এতদিন। জাভেদ যখন কথা বলছিলো তার মা ও বাপুর সঙ্গে তখন ফুল্লরা তাকিয়ে থাকে নির্বাক চোখে ওর দিকে। ফুল্লরার ছোটবেলার সাথী জাভেদ যেমন বনহুরের শিশুবেলায় সর্বক্ষণের সাথী ছিলো নূরী তেমনি ফুল্লরা আর জাভেদ।

ফুল্লরা ছোটবেলায় চুরি হয়ে গেলো।

মালোয়া তাকে নীলমনি হার সহ চুরি করে নিয়ে দূরে বহুদূরে চলে গিয়েছিলো। তাকে নাচতে শিখিয়েছিলো এমনকি শহরে শহরে নগরে বন্দরে তাকে নাচিয়ে পয়সা উপার্জন করতো মালোয়া।

যা হোক, মালোয়ার একটা গুণ ছিলো সে ফুল্লরাকে একা পেয়েও কোনোদিন তার উপর জঘন্য আচরণ করেনি। চেয়েছিলো ফুল্লরা বড় হয়ে তাকে আত্মসমর্পণ করতে কিন্তু তা করেনি। তাই শেষ দিকটায় মালোয়া ওকে জোরপূর্বক আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সে বিফলকাম হয়েছে।

ফুল্লরা কালনাগিনীর মত তাকে ছোবল মেরেছে, তাই মালোয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবে কতদিন আর সে নিজকে মালোয়ার কাছ থেকে হেফাজতে রাখতে পারতো তা সঠিক করে বলা যায় না। বলা যায় না ফুল্লরা এতদিন জীবিত থাকতে পারতো কিনা। ভাগ্যিস সর্দার দেবদূরের মত গিয়ে হাজির হয়েছিলো সেদিন তাই রক্ষা....

ফুল্লরার চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, জাভেদ তখন বলছে—বাপু, আমি জানি কে, তোমার শরীরে আঘাত করেছে, আমি তাকে উচিত শিক্ষা দেবো।

বনহুর বললো—পুলিশবাহিনীর গুলী আমার শরীরের কিছু অংশ ভেদ করেছিলো তাই...

পুলিশবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো কে। প্রখ্যাত গোয়েন্দা নুরুজ্জামান চৌধুরী। আমি তাকে শায়েস্তা না করে ছাড়বো না। দাঁতে দাঁত পিষে বললো জাভেদ।

ঠিক যেমন করে বলে বনহুর।

নূরী পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, সে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

জাভেদ যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো ঝড়ের বেগে।

আস্তানার কেউ তাকে বাধা দিতে পারলো না।

এমনকি বনহুরও কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে গেলো সে।

আস্তানার মুখে পথ আগলে দাঁড়ালো ফুল্লরা।

জাভেদ থমকে দাঁড়ালো, ফিরে তাকালো সে ফুল্লরার মুখের দিকে।

চোখে চোখ পড়তেই জাভেদ ভ্রুকুচকে দাঁড়ালো।

ফুল্লরা হেসে বললো—আমাকে চিনতে পারছো না? আমি ফুল্লরা, তোমার খেলার সাথী ছিলাম একদিন—

ফুল্লরা!

হাঁ জাভেদ।

পথ ছাড়ো।

না।

কেন?

কতদিন তুমি আসোনি...

ফুল্লরা পথ ছাড়ো, আবার আসবো।

সত্যি কথা দিচ্ছো?

হাঁ দিলাম। কথাটা বলে জাভেদ বেরিয়ে গেলো দ্রুতগতিতে।

ফুল্লরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তার চোখ দুটো আনন্দদীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

খুশি উপচে পড়ছে যেন ফুল্লরার সারা অঙ্গে।

•

❑

নূর চমকে ফিরে তাকালো।

পেছনে কালো কাপড়ে মুখের অর্ধেক ঢাকা গায়ে জমকালো পোশাক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে, হাতে তার রিভলভার।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে নূর ড্রয়ার খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই জমকালো মূর্তি তার পিঠে রিভলভার চেপে ধরলো—খবরদার!

নূর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো ছায়ামূর্তির পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সে প্রথম নজরেই বুঝতে পারলো এ ছায়ামূর্তি স্বয়ং দস্যু বনহুর নয়, তবে ঠিক তারই মত হয়তো বা কোনো এক দস্যু বা ডাকু।

কি দেখছো অমন করে? জমকালো পোশাকপরা ছায়ামূর্তি বললো।

বললো নূর—কে তুমি তাই চিনবার চেষ্টা করছি।

ও, চিনতে পারোনি তাহলে?

দস্যু বনহুর তুমি নও জানি।

হাঁ।

তবে তুমি কে?

পরিচয় জেনে তোমার কোনো লাভ হবে না। তুমি এখন মৃত্যু পথযাত্রী—

নূর এতক্ষণ বসেই শুনছিলো, এবার সে উঠে দাঁড়ালো এবং আচমকা প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো জমকালো মূর্তির চোয়ালে।

ছায়ামূর্তি অন্য কেউ নয়—জাভেদ। সে নূরের ঘুষিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো না। সামান্য কাৎ হয়ে পড়লো একটা চেয়ারের উপরে, সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাল্টা ঘুষি বসিয়ে দিলো নূরের চোয়ালে।

নূর টাল সামলে নিলো এবং জাপটে ধরলো জমকালো পোশাক পরিহিত জাভেদকে।

শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। ঠিক ঐ মুহূর্তে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ প্রবেশ করলো ভিতর দরজা দিয়ে।

পুলিশগণ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো। তখনও চলেছে মল্লযুদ্ধ নূর এবং জাভেদ মিলে।

হাতে অস্ত্র থাকলেও পুলিশগণ তারা অস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ যে কোনো মুহূর্তে নূর আহত অথবা নিহত হতে পারে।

জাভেদ পুলিশবাহিনীকে গুলী ছোড়ার সুযোগ দিলো না। নূরকে সম্মুখে ধরে পিছু হটতে লাগলো। হঠাৎ নূর জাভেদের চোয়ালে বসিয়ে দিলো এক প্রচন্ড ঘুষি।

জাভেদ ধাক্কা খেয়ে পড়লো ওদিকের দরজার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো, পড়ে গেলো জাভেদ দরজার পাশে মেঝেতে।

পুলিশবাহিনী গুলী ছুড়লো তাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু ততক্ষণে জাভেদ বাইরে বেরিয়ে গেছে।

পুলিশবাহিনী গুলী ছুড়তে লাগলো এলোপাতাড়ি।

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেছে।

উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো জাভেদের অশ্ব।

পুলিশবাহিনী দোতলার রেলিং থেকে অবিরাম গুলী নিক্ষেপ করে চললো।

নূর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

রিভলভার রেখে দিলো সে কোমরের বেল্টে। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, নূর গাড়িতে চেপে বসলো, তারপর ছুটলো সে উল্কাবেগে।

যেদিকে অশ্বপদ শব্দ শোনা যাচ্ছিলো সেইদিকে গাড়ি ছুটালো নূর।

শহর ছেড়ে গ্রামঞ্চলের পথ ধরলো জাভেদ।

নূর তার অশ্বপদ শব্দ লক্ষ্য করে গাড়ি চালাচ্ছে। আঁকাবাঁকা পথ সে অতিক্রম করে এগুচ্ছিলো। উদ্দেশ্য যেমন করে হোক অশ্বারোহীকে সে গ্রেপ্তার করবেই। গাড়িতে বসেই রিভলভারখানা বের করে ড্রাইভিং আসনের পাশেই রেখেছিলো। নাগালের মধ্যে পেলেই সে গুলী ছুড়বে।

কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ আসছিলো না।

নূর যত দ্রুত গাড়ি চালিয়ে অশ্বটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে চাইছে ততই জাভেদ তার অশ্বটাকে এলোপাতাড়িভাবে চালনা করছিলো।

রাজপথ এড়িয়ে গ্রাম্যপথ তারপর জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে, যেন তাকে কিছুতেই পাকড়াও করতে না পারে। অবশ্য জাভেদের মনে একটা উদ্দেশ্য আছে নূরকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারলে তাকে পাকড়াও করবে।

বেশি কিছুদূর এসে জঙ্গলের কাছাকাছি গাড়িখানা থেমে গেলো আচমকা।

নূর হকচকিয়ে গেলো।

তার গাড়িখানা এভাবে আটকে যাবে ভাবতেও পারেনি সে, কিছুদূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলো সেই জমকালো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে।

মুহূর্ত ভাববার সময় না দিয়ে জাভেদ নূরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নূর সেই দন্ডে গুলী করলো তার বুক লক্ষ্য করে।

জাভেদ মাথাটা কাৎ করে উবু হয়ে পড়লো।

গুলীটা তার পাশ কেটে চলে গেলো।

জাভেদ গাড়ির ভিতরে বুকে চেপে ধরলো নূরের বুকে রিভলভারখানা।

নূর সুবোধ বালকের মত গাড়ি থেকে নেমে পড়লো কিন্তু পর মুহূর্তেই সে ভীষণ এক আঘাত হানলো জাভেদের দেহে।

ছিটকে পড়লো জাভেদ।

পরক্ষণেই চোখের পলকে সে উঠে দাঁড়ালো, তার দু'হাতে দুটি মারণাস্ত্র। চোখ দুটি দিয়ে যেন তার আগুন বের হচ্ছে।

নূরের হাত থেকে তার অস্ত্র পড়ে গিয়েছিলো, তাই সে হাত তুলে দাঁড়াতে বাধ্য হলো।

❑

নূরকে বন্দী অবস্থায় যখন দরবারকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তার দু'চোখে কালো রুমাল বাঁধা ছিলো, হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা।

হাজির করা হলো দরবারকক্ষে।

চোখের বাঁধন খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নূর চমকে উঠলো, তার সম্মুখে সুউচ্চ আসনের পাশে দন্ডায়মান জমকালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি।

জমকালো পোশাক পরা ব্যক্তিই যে স্বয়ং দস্যু বনহুর চিনতে বাকি রইলো না নূরের। জমকালো মূর্তির পাশেই দন্ডায়মান সেই তরুণ যে তাকে কৌশলে বন্দী করে আনতে সক্ষম হয়েছে।

জমকালো মূর্তির মুখ অর্ধেক ঢাকা।

মাথায় কালো পাগড়ি।

শুধুমাত্র চোখ দুটো নজরে পড়ছে নূরের।

বনহুরও যে চমকে উঠেনি তা নয়, কিন্তু মুহূর্তে নিজকে সামলে নিলো। যদি তার মুখমন্ডলের কিছু অংশ জমকালো কাপড়ে ঢাকা না থাকতো তাহলে তার মুখোভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করে জাভেদ বিস্মিত না হয়ে পারতো না।

ভাগ্যিস বনহুরের মুখের কিছু অংশ ঢাকা ছিলো তাই রক্ষা, না হলে কিছুতেই নিজকে নূর এবং জাভেদের দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখতে পারতো না।

বনহুর দেখলো নূরকে, প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নূর তারই ছেলে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর মুখের দিকে।

নূর দাঁতে দাঁত পিষছিলো, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো বনহুরের দিকে।

জাভেদ দক্ষিণ হাতে পিস্তল দোলাচ্ছিলো, তার মুখে জয়ের উল্লাস ফুটে উঠেছে। তাকাচ্ছিলো সে একবার বাপুজীর মুখে, আবার বন্দী নূরের দিকে।

বনহুরকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে বললো জাভেদ—সর্দার, এই সেই গোয়েন্দা যে আপনার দেহে গুলীবিদ্ধ করেছিলো। আমি ওকে কৌশলে বন্দী করে এনেছি। এবার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া দরকার।

জাভেদের কথাগুলো বড় কঠিন ছিলো।

নূর শুধু তাকিয়ে ছিলো, সে কোনো কথা বলছে না, হিংস্র সিংহের মত ফুলছে ভিতরে ভিতরে।

বনহুর জাভেদের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো, বললো—বন্দীই আমাকে গুলী বিদ্ধ করেছিলো তার প্রমাণ যদিও নেই তবু আমি বন্দীকে আটক রাখতে বাধ্য হবো, কারণ সে আমাকে গ্রেপ্তার করতে সর্বক্ষণ সজাগ রয়েছে।

হাঁ, শুধু তাই নয়, বন্দীকে আটক রেখে পুলিশবাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগকে শায়েস্তা করতে হবে। তারা জানে না দস্যু বনহুর কত শক্তিমান আর কঠিন...কথাগুলো বলে জাভেদ সর্দারের মুখের দিকে তাকালো।

দরবারকক্ষে যারা ছিলো তাদের সবারই মুখে পাগড়ির আঁচল জড়ানো। নূর কারো মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। যদি সে স্পষ্ট দেখতো তাহলে আর একজনকে সে চিনতে পারতো সে হলো রহমান।

দরবারকক্ষে বেশ কয়েকটা মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে বনহুরের অনুচরদের সবাইকে অদ্ভুত লাগছে। দেয়ালে নানা ধরনের অস্ত্র ঝুলছে। একপাশে স্তূপকার জমকালো পোশাক।

নূর চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললো—দস্যু তোমরা আমাকে বন্দী করে কিছুতেই পুলিশবাহিনীকে শায়েস্তা করতে পারবে না। কারণ তারা তোমাদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেবে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো জাভেদ, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—আমাদের ষড়যন্ত্র না তোমরাই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিলে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে তাকে হত্যা করবে, আর তাকে হত্যা করে অসৎ ব্যক্তিদেরকে দুষ্কর্ম করতে সুযোগ-সুবিধা করে দেবে!

নূর বলে উঠলো—অসৎ ব্যক্তি হলে তোমরা। তোমরা রাতের অন্ধকারে নিরীহ নগরবাসীর উপর হামলা করে তাদের যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নাও, হত্যা করো ঘুমন্ত মানুষগুলোকে।

না, আমরা কোনো সময় নিরীহ মানুষের উপর হামলা করি না। এ তোমার ভুল ধারণা। কথাটা গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর স্বয়ং।

নূর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—তাহলে তোমরা নিজেদের সাধু বলতে চাও?

সাধুতা ভন্ডামি আমরা করি না তবে যারা দেশের ও দশের শত্রু আমরা তাদের রক্ত শুষে নেই...বনহুর এবার আসনের পাশ থেকে সরে এলো একপাশে, পুনরায় বললো—দেশকে যারা তিল তিল করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, যারা নিরীহ মানুষকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দিচ্ছে না, যারা জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে, তাদের আমরা ক্ষমা করি না।

নূর বলে উঠলো খুব তো বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছো কিন্তু যত কথাই বলো রেহাই নেই তোমাদের। আমাকে তোমরা আজ আটক করলেও আটকে রাখতে পারবে না। মুক্ত আমি হবোই এবং দস্যু বনহুর, আমি তোমাকে বন্দী করবোই। শুধু তাই নয়, তোমাকে আমি তিল তিল করে হত্যা করবো যেমন তুমি হত্যা করেছো বহু মানুষকে।

জাভেদ ক্রুদ্ধ বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লো নূরের উপর।

নূরের দেহ কিন্তু একটুও টললো না।

জাভেদ পিস্তল চেপে ধরলো নূরের বুকে—এই মুহূর্তে আমি তোমাকে হত্যা করবো।

বনহুর দ্রুত এগিয়ে এলো এবং জাভেদের পিস্তলসহ হাতখানা নামিয়ে দিলো নিচে। বললো—না, ওকে হত্যা করো না জাভেদ।

জাভেদ অধরদংশন করে সরে দাঁড়ালো একপাশে।

বনহুর বললো যাও ওকে নিয়ে যাও। সাবধানে বন্দী করে রাখোগে।

কায়েস এবং রহমান নূরকে বন্দীশালালায় নিয়ে চললো। তার চারপাশে চললো বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী প্রহরী।

❑

বনহুরের বন্দীশালায় বন্দী হয়ে নূর ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলো। সে হিংস্র বাঘের মত ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। ভাবতেও পারেনি এভাবে সে বন্দী হবে। যে বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য সে সাধনা করে চলেছে, সেই বনহুরের বন্দীশালায় তাকেই আটক হতে হলো।

মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো নূর।

বারবার সে মেঝের পাথরখন্ডে বসে দু'হাতের মধ্যে মুখ রেখে নিজের ক্রুদ্ধভাব দমন করার চেষ্টা করতে লাগলো।

রাতের খাবার পড়ে আছে এখনও।

দুপুরের খাবার দিয়ে গেছে কিন্তু তাও স্পর্শ করেনি নূর। সে খাবারের দিকে ফিরেও চায়নি একবারও।

কথাটা বনহুরের কানে গেলো।

সে ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—রহমান, তুমি যাও, নূর কাল থেকে খাবার মুখে দেয়নি।

কে বললো সর্দার এ কথা?

কায়েস বলেছে। নূর নাকি কাল থেকে মানে তাকে বন্দীশালায় আটক করার পর থেকে কিছু মুখে দেয়নি।

যাও তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো।

সর্দার, আমার পক্ষে কিছু অসুবিধা হবে, কারণ...

হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি যা বলতে চাইছো। তোমাকে নূর চিনে ফেলতে পারে।

ঠিক বলেছেন সর্দার।

তাহলে কি করা যায় বলো? শুধু তুমি জানো নূর আমার কে আর জানে আর একজন—সে হলো নূরী।

হাঁ সর্দার।

কিন্তু নূরীকে কিছুতেই এ কথা জানানো যাবে না। যদি সে জানতে পারে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রহমান?

বলুন সর্দার?

একটা ব্যাপারে আমি পুলিশমহলের উপর খুব খুশি হয়েছি। তারা দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সমস্ত ডায়রী এবং রেকর্ড গোপন রেখে নতুনভাবে ডায়রী তৈরি করে রেখেছে যার মধ্যে নূর খুঁজে পাবে না চৌধুরীবাড়ির সঙ্গে বনহুরের কোনো সম্বন্ধ আছে। অতি সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করেছেন গোয়েন্দা প্রধান শংকর রাও। তিনি সকলের অগোচরে আত্মগোপন করে বনহুরের সন্তানকে দিয়ে বনহুরকে সায়েস্তা করতে চান।

সর্দার, শুনেছিলাম প্রখ্যাত গোয়েন্দা শংকর রাও নাকি বিদেশ গেছেন।

বিদেশ যাবার নাম করে তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন।

এ কথা সত্যি সর্দার?

হাঁ, আমি আরও জানি শংকর রাও এখন কোথায় আছেন। একটু থেমে বললো বনহুর—শঙ্কর রাও আত্মগোপন করে সঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন! তারই নির্দেশমত পুলিশমহল দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কাজ করছে এবং কান্দাই পুলিশ অফিস থেকে সব রেকর্ড সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সর্দার প্রখ্যাত গোয়েন্দা শঙ্কর রাও তাহলে...

বিদেশে যাননি, তিনি কান্দাই শহরেই আছেন।

তাহলে নূর কি তাঁর নির্দেশমতই কাজ করছে?

নির্দেশ ঠিক নয়, তবে তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। রহমান, একটা কাজ করো—কায়েস অথবা হীরালালকে পাঠিয়ে নূরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান বেরিয়ে আসে সর্দারের বিশ্রামাগার থেকে।

আড়াল থেকে সব শুনে ফেলে নূরী। সে কোনো কাজে সর্দারের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনতে পায়

বনহুর আর রহমানের কথাগুলো। বুঝতে পারে নূরকে বন্দী করে আনা হয়েছে কান্দাই আস্তানায় এবং সে বন্দী হবার পর থেকে কিছু মুখে দেয়নি।

নূরীর মাতৃহৃদয় ব্যথায় টনটন করে উঠলো। সে নূরের কথা স্মরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নূরের শিশুকালের চেহারাটা। তার কচি মুখের আধো আধো বুলিগুলো প্রতিধ্বনি হলো নূরীর কানের কাছে।

মুহূর্ত বিলম্ব করলো না নূরী, যেমন সে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলো তেমনি আড়ালে থেকেই সরে গেলো আলগোছে।

একথালা খাবার নিয়ে হাজির হলো বন্দীশালার দরজায়।

বন্দীশালার ফটকে প্রহরী কিছু বলবার পূর্বেই বললো নূরী দরজা খুলে দাও।

অবাক হয়ে বললো প্রহরী—এ আপনি কি বলছেন?

যা বলছি করো, দরজা খুলে দাও।

সর্দারের নির্দেশ ছাড়া আমি দরজা খুলতে পারি না। বললো প্রহরী।

নূরী প্রহরীর বুক লক্ষ্য করে পিস্তল চেপে ধরলো। অপর দু'জন জোয়ানকে বললো—একে বেঁধে রাখো মজবুত করে।

নূরীর সঙ্গেই তারা এসেছিলো, কাজেই নূরীর নির্দেশ মানতে তারা বাধ্য। নূরী ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রহরীকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো।

এবার নূরী খুলে ফেললো কারাগারের দরজা।

প্রবেশ করলো সে ভিতরে।

ওপাশে একটা পাথরখন্ডের ওপর সকলের খাবার এখন পড়ে আছে তেমনি। নূরীর সঙ্গে একজন সহচরী এসেছে, তার হাতে খাবারের থালা।

নূরী বন্দী নূরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

নূর ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলো।

নূরী বললো—বন্দী!

ফিরে তাকালো নূর।

দু'চোখে তার বিস্ময়। অবাক হয়ে তাকালো সে নূরীর মুখের দিকে।

নূরীও কিন্তু আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলো নূরকে। সেই ছোট্ট শিশুটি আজ কত বড় হয়েছে তার পিতার গভীর নীল চোখ দুটো যেন ওর চোখের মধ্যে ফুটে উঠেছে। বনহুরের মুখখানাই যেন সে দেখতে পেলো যেমন দেখতে পায় জাভেদের মুখে।

নূরী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে নূরের মুখের দিকে।

নূরও কম বিস্মিত হয়নি, কারণ এই মহিলা তাকে এমন করে দেখছে কেন? তার মধ্যে কিসের সন্ধান সে করছে? কি খুঁজছে মহিলা

নূরী বলে উঠলো—কি ভাবছো?

নূর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, কোনো জবাব দিলো না।

নূরী আরও এগিয়ে এলো ওর পাশে, একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

নূর অন্যমনস্ক না হলেও সে বেশ উদাসভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

নূরী বললো—কাল থেকে কিছু মুখে দাওনি কেন?

এবার নূর ওর কথার মধ্যে খুঁজে পেলো মমতার ছোঁয়া। কে এই মহিলা কে জানে। নূর নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো নূরীর দিকে।

নূরীর দু'চোখের পাতা ভিজে উঠলো।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নূরের ছোটবেলার মুখখানা। গন্ড বেয়ে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো তার। তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বললো নূরী—কিছু মুখে দাওনি কেন?

নূর নিশ্চুপ।

তার মনে বিস্ময়ের দোলা।

কে এই নারী?

কোনোদিন তাকে কোথাও দেখেছে কিনা।

না, স্মরণ হচ্ছে না তার।

নূরকে ভাবতে দেখে বলে নূরী—কি ভাবছো?

এবার কথা বললো নূর—সে কথা তোমার জেনে কোনো লাভ নেই। আমার যা ভাববার ভাবতে দাও।

না, তোমাকে এভাবে ভাবতে দেবো না।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তাকায় নূর। ওর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন অধিকারের সুর।

নূরী বলে—এসো খাবার খাও। নূরী তার সহচরীর হাত থেকে খাবারের থালাটা নিয়ে পাথরখন্ডটার উপরে রাখলো। পুনরায় বললো—এসো খাও!

নূর বললো—আমি খাই বা না খাই তাতে তোমার কি?

নূরী কিছু বলতে গেলো কিন্তু কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এলো, শুধু বললো—সে তুমি বুঝবে না, খাও...

নূর এবার না করতে পারলো না, সে পাথরখন্ডটার পাশে এসে দাঁড়ালো।

নূরী থালাটা তুলে ধরলো নূরের সামনে।

নূর খেতে লাগলো।

পরিতৃপ্ত হলো নূরী।

ওর খাওয়া শেষ হলে যেমনভাবে বন্দীশালায় প্রবেশ করেছিলো তেমনিভাবে বেরিয়ে এলো নূরী আর তার সহচরী।

বন্দীশালার বাইরেই অপেক্ষা করছিলো প্রহরীদ্বয় যারা নূরী ও তার সহচরীর সঙ্গে এসেছিলো। নূরী বেরিয়ে আসতেই তারা বন্দীশালার দরজা বন্ধ করে দিলো।

এবার ওরা ফিরে চললো আস্তানার অভ্যন্তরে নিজ বিশ্রামাগারের দিকে।

নূরী যখন তার বিশ্রাম গুহায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে তখন পথ আগলে দাঁড়ালো জাভেদ।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকালো নূরী, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—জাভেদ!

হাঁ, কোথায় গিয়ে ছিলে আম্মু?

তা তোকে বলতে হবে কেন?

আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে।

বেশ তো, তাহলে কেন প্রশ্ন করছিস?

আম্মু, এমনভাবে বন্দীশালায় তোমার যাওয়া মোটেই সমীচীন হয়নি!

পথ ছাড়ু জাভেদ।

না।

কেন?

তোমাকে জবাব দিতে হবে কেন তুমি বন্দীশালায় গিয়েছিলে?

বন্দীকে দেখতে এবং তাকে খাওয়াতে গিয়েছিলাম।

বন্দীকে তুমি দেখতে এবং খাওয়াতে গিয়েছিলে আম্মু!

হাঁ।

চমৎকার!

পথ ছাড়ু জাভেদ!

না, তোমাকে জবাব দিতে হবে।

কেন তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, কেন তাকে খেতে দিয়েছি....

হাঁ। সে একজন বন্দী। তাছাড়া সে আমারদের চরম শত্রু। শুধু শত্রুই নয়, বাপুকে সে গ্রেপ্তারের জন্য উম্মাদ, এমন কি জীবন দিয়েও সে বাপুকে গ্রেপ্তার করবে বলে শপথ করেছে। আর তুমি তাকে দেখতে এবং খাওয়াতে গিয়েছিলে?

হাঁ।

কিন্তু কেন?

বন্দী হলেও সে একজন মানুষ—তাছাড়া বয়স তার এমন বেশি নয়, তোর মতই...তাই...

তাই তুমি দয়া দেখাতে গিয়েছিলে?

হাঁ, বন্দী হলেও সে...

তোমার সন্তানের মত, তাই না আম্মু?

সত্যি তাই...

কিন্তু মনে রেখো, আজ রাতেই আমি তাকে হত্যা করবো। যে বাপুকে গ্রেপ্তারের জন্য উন্মাদ, যে বাপুর শরীরে গুলীবিদ্ধ করে তাকে আহত করেছিলো, আর তুমি কিনা তাকে দয়া দেখাতে গিয়েছিলে?

নূরীর মাথাটা যেন বন্‌বন্‌ করে ঘুরে উঠলো, পুত্রের কথাটা তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো...আজ রাতেই আমি তাকে হত্যা করবো...আজ রাতেই আমি তাকে হত্যা করবো...

নূরী পুত্রের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত তার পাশ কেটে চলে গেলো।

জাভেদ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর চলে গেলো।

নূরী সোজা বনহুরের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে চেপে ধরলো তার জামার আস্তিন, বললো—জাভেদ যাকে বন্দী করে এনেছে সে তোমার কে তা তো তুমি জানো, তবু কেন নীরব আছো?

জাভেদ যা করছে তার উপর আমার করবার কিছু নেই।

সত্যি বলছো?

তাছাড়া উপায় কি বলো?

হুর, তোমার মুখে এ ধরনের জবাব শুনবো ভাবতে পারিনি। একটু থেমে বললো নূরী—তোমার এক সন্তান অপর এক সন্তানের হাতে নিহত হোক, এই তুমি চাও?

নূরী!

হাঁ। জাভেদ বলেছে সে তাকে আজ রাতে হত্যা করবে।

বনহুর শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থা ছিলো, এবার শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে শুরু করলো, মুখমন্ডলে একটা দীপ্তভাব ফুটে উঠেছে যেন।

নূরী বললো—তুমি নূরকে উদ্ধার করো।

আমি নিরুপায়।

সেকি!

হাঁ, আমি পারবো না তাকে জাভেদের কাছ থেকে মুক্ত করতে।

সত্যি বলছো হুর?

হাঁ, সত্যি বলছি।

বেশ, আমি তোমাকে আর অনুরোধ করবো না। কথাটা বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো নূরী।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো ক্ষীণ হাসির রেখা।

পুরী ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

বনহুর পুনরায় শয্যায় বালিশে হেলান দিয়ে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

❑

গভীর রাতে একটা শব্দ হলো।

নূর সজাগ হয়ে কান পাতলো, তবে কি তাকে হত্যা করার জন্য দস্যু দলের কেউ কারাকক্ষে প্রবেশ করলো। আজ রাতে তাকে হত্যা করা হবে, একথা নূরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। নূর মৃত্যু ভয়ে ভীত না হলেও গভীর চিন্তা করছিলো কি ভাবে সে এই দস্যু দলের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। তার জুতোর গোড়ালির মধ্যে অদ্ভুত এক ক্ষুদে ওয়্যারলেস মেশিন, এখানে বন্দী হবার পর নূর পুলিশমহলকে জানিয়ে দিয়েছিলো সে দস্যু বনহুরের বন্দীশালায় বন্দী। কিন্তু সে পথের নির্দেশ দিতে পারলো না। কারণ তাকে গ্রেপ্তারের পর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দু'চোখ কালো কাপড়ে ঢেকে আস্তানায় আনা হয়েছে। তা ছাড়া তাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে আনা হয়েছে; কাজেই সে বুঝতেই পারেনি তাকে কোথায় আনা হয়েছে।

পুলিশমহল নূরের নিরুদ্দেশ নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ কোথায় গেলো সে, কেউ জানে না।

বিশেষ করে পুলিশ প্রহরীরাও ঠিকভাবে জানতে পারেনি রাতের অন্ধকারে নুরুজ্জামান চৌধুরী কোথায় গেলেন। তবে দু' একজন প্রহরী কিছুটা সন্ধান জানাতে পেরেছিলো যারা নূরকে রাতের অন্ধকারে অশ্বপদশব্দ লক্ষ্য করে গাড়ি চালাতে দেখেছে।

কিন্তু সঠিক কেউ কিছু বলতে পারেনি।

হঠাৎ ওয়্যারলেসে নূরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে পুলিশমহল বুঝতে পারলো নুরুজ্জামান চৌধুরী যেখানেই থাক তিনি জীবিত আছেন এবং তারা আরও বুঝতে পারলেন দস্যু বনহুরের কবলে পড়েছেন।

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত কান্দাই শহরে।

এমন কি সংবাদটা পৌঁছে গেলো চৌধুরীবাড়িতেও। চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন চৌধুরীবাড়ির সবাই সরকার সাহেব যখন এসে বললেন কাল রাত থেকে নূরকে তার বাসভবনে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিলো সবার। মনিরা তো থ' হয়ে গিয়েছিলো। তার গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছিলো না।

মরিয়ম বেগম চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, তাঁর ধারণা নূরকে শত্রুগণ হত্যা করে ফেলেছে, আর তাকে কোনোদিন খুঁজে পাবেন না। তিনি বারবার সরকার সাহেবকে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করছিলেন—আপনি কি ঠিক জানেন নূর সত্যি তার বাসভবনে নেই।

হাঁ বেগম সাহেবা, আমি নিজে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে এসেছি। নূরকে কোথাও খুঁজে পাইনি। তবে গ্যারেজ তার গাড়িখানাও নেই। আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি যে নূর যেখানেই যাক সে তার গাড়ি নিয়ে গেছে।

মনিরা এবং মরিয়ম বেগম এতে মোটেই আশ্বস্ত হননি বরং আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

গাড়ি নিয়ে রাতের বেলায় সে গেলো কোথায়?

বারবার পুলিশ অফিসে টেলিফোন করে জানতে পারেননি কিছু, নূরের সন্ধান দিতে পারেননি কেউ।

সংবাদ শুনে শংকর রাও তাঁর গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর সতর্কতার অন্ত নেই, তিনি অতি কৌশলে কান্দাই পুলিশ অফিস থেকে বনহুরের সম্বন্ধে রিপোর্টগুলো সরিয়ে ফেলেছেন। যেন দস্যু বনহুরকে তারই পুত্র দ্বারা শায়েস্তা করতে পারেন।

শংকর রাওকে দস্যু বনহুর বেশ নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে তাই তাঁর এত রাগ, তাকে কাবু না করা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

নূর জন্মাবার পূর্ব হতে কান্দাই পুলিশ বাহিনী বনহুরের সম্বন্ধে সব অবগত আছেন বটে কিন্তু সব পুলিশ অফিসারই তো চিরদিন এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে থাকেন না। বদলীর চাকরি, তাই এক আসেন এক চলে যান। তবে পুলিশ অফিসে ডায়রীতে ঘটনাগুলো লিখা হয়ে থাকে। শংকর রাও সেকালের দক্ষ গোয়েন্দা তিনি মিঃ জাফরীর সঙ্গে কাজ করেছেন দীর্ঘকাল। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেছিলেন এবং কয়েক বার বনহুরকে গ্রেপ্তারও করেছিলেন কিন্তু আটক করে রাখতে পারেননি তাঁরা তাকে।

একজন দস্যুর নিকটে পুলিশ প্রধানদের পরাজয় সত্যি লজ্জাকর, তাই পুলিশপ্রধান মিঃ আহমদ সরে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে সরে পড়েছিলেন অনেকে।

মিঃ জাফরী বৃদ্ধ বয়সেও ছেড়ে দিলেন না। তিনিই একমাত্র প্রধান ছিলেন যিনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের শপথ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ সময় কান্দাই অবস্থান করেছেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি বাইরেও গেছেন হয়তো বা কয়েক মাস অথবা বছরের জন্য, আবার তিনি ফিরে এসেছেন কান্দাই শহরে।

বনহুর তাঁকেই শুধু নয়, কান্দাই পুলিশবাহিনীকে নানাভাবে নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে, তাই শংকর রাও শপথ গ্রহণ করেছেন তিনি বনহুরকে দেখে নেবেন এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সুদীর্ঘ কাল ধরে বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে চলেছেন।

মিঃ জাফরী ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা এবং সঙ্গী বলা চলে। তিনি বহুকাল ধরে বনহুরকে গ্রেপ্তারে উৎসাহী ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এলো পরিবর্তন। দস্যু বনহুরের মহত্বের কাছে হলো তাঁর পরাজয়।

যিনি দস্যু বনহুরের নামে উন্মত্ত ছিলেন, যাঁর শপথ ছিলো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার এবং তাকে সায়েস্তা করা, কিন্তু সে দক্ষ পুলিশ প্রধান গেলেন পাল্টে। তিনি দস্যু বনহুরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন এবং সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন।

মিঃ জাফরীর মন আজ বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। তিনি বুঝতে পেরেছেন এমন হৃদয়বান পুরুষ পৃথিবীতে কমই আছে যাদের লোভ লালসা মোহ নেই। মিঃ জাফরী নিজে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তিনি দস্যু বনহুরের পিছু ত্যাগ করে একজন স্বাভাবিক নাগরিকের মত জীবন যাপন করছেন।

কিন্তু মিঃ শংকর রাও দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে ক্ষান্ত হননি। একদিন তিনি যুবক ছিলেন, আজ তিনি বয়সের শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছেন তবু তাঁর শপথ থেকে পিছপা হননি। আজও তিনি আত্মগোপন করে অত্যন্ত কৌশলে কাজ করছেন।

শংকর রাও জানতেন পুলিশ অফিস থেকে দস্যু বনহুরের আসল পরিচয় ডায়রীর খাতায় লিপিবদ্ধ করা ছিলো তা অতি সতর্কতার সঙ্গে সরিয়ে ফেলতে হবে, নাহলে তার সন্তান প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নুরুজ্জামন চৌধুরীকে দিয়ে সঠিকভাবে কাজ করানো সম্ভব হবে না।

অবশ্য মিঃ শংকর রাওকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে।

শংকর রাও অতি সাবধানে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং সে কারণেই আজও প্রখ্যাত ডিটেকটিভ হয়েও নুরুজ্জামন জানতে পারেনি দস্যু বনহুরের সঙ্গে চৌধুরী বাড়ির কি সম্বন্ধ! অবশ্য পুলিশ মহলে এখন যে সব কর্মকর্তা রয়েছেন তাঁরা সবাই নতুন, কাজেই অনেকে জানেন না দস্যু বনহুরের সঙ্গে চৌধুরী বাড়ির কি সম্পর্ক।

নুরুজ্জামান যে চৌধুরীবাড়ির ছেলে এটা সবাই জানেন। এতে কারও মনে কোনো সন্দেহের উদ্বেগ হয়নি। তবে পুলিশমহলের প্রখ্যাত পুলিশ সুপার মিঃ হারুন জানেন। তিনিও কান্দাই ছেড়ে এখন অনেক দূরদেশে রয়েছেন।

ইদানীং পুলিশমহল চৌধুরীবাড়ির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা থেকে ক্ষান্ত হয়েছেন, কারণ সুদীর্ঘ সময় দস্যু বনহুরের কোনো সন্ধান ছিলো না। তবে নূরকে সেদিন জানানো হয়েছিলো বনহুর চৌধুরী বাড়িতে হানা দেবে। এবং সে কারণেই নূর পুলিশবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত ছিলো চৌধুরী বাড়ির চারপাশে।

নুরুজ্জামান বুদ্ধিমান বটে তাই বলে সে এখনও শংকর রাওয়ের মত ধূর্ত গোয়েন্দা হতে পারেনি।

মিঃ জাফরীর নিকটে পুলিশবাহিনী আর কোনো সহায়তা পান না, কারণ মিঃ জাফরী তখন বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে সম্পূর্ণ বিরত আছেন, কারণ বনহুর তার জীবনরক্ষাকারীই নয়, বনহুরের মহত্ব তাকে মুগ্ধ বিস্মিত করেছে।

আজ মিঃ জাফরী তাই দক্ষ পুলিশপ্রধান হয়েও চাকরি ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

বনহুর কান্দাই ফিরেই একদিন দেখা করেছে মিঃ জাফরীর সঙ্গে। বনহুর জাফরীর বন্ধু বনে গেছে এখন। যে কোনো মুহূর্তে বনহুর মিঃ জাফরীর সঙ্গে দেখা করে আসে।

রহমান বন্দী হবার পর পুলিশমহল যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারলো সে দস্যু বনহুর নয়, এমন কি মিঃ জাফরীকেও হাঙ্গেরী কারাগারে আনা হয়েছিলো সত্যি সে বনহুর কিনা সঠিক প্রমাণ করার জন্য।

গভীরভাবে তদন্ত করে যখন পুলিশ মহল জানতে পারলো বন্দী ব্যক্তি বনহুর নয় তখন রহমানকে মুক্ত করে দিয়েছিলো।

রহমান মুক্তিলাভ করেই সবার অলক্ষ্যে দেখা করতে গিয়েছিলো চৌধুরীবাড়ি মনিরার সঙ্গে কিন্তু সাক্ষাৎলাভের সুযোগ ঘটেনি, ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলো রহমান কান্দাই শহরের আস্তানায়। তারপর এক সময় পৌঁছে গিয়েছিলো কান্দাই জঙ্গলে তাদের আসল আস্তানায়।

যদিও রহমান তার একটা হাত হারিয়ে ছিলো তবু সে দুর্বল না হয়ে উঠেছিলো আরও দুর্দান্ত ভয়ংকর। পূর্বের চেয়ে রাগটা আরও বেড়ে গিয়েছিলো তার চরমভাবে। পুলিশমহল থেকে ছাড়া পেয়ে সে নিজকে ধন্য মনে করেনি, বরং সে নিজকে করুণার পাত্র মনে করেছিলো এবং সে কারণেই রহমান পুলিশের প্রতি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

এমন দিনে জাভেদ বন্দী করে নিয়ে এলো নুরুজ্জামান চৌধুরী নূরকে।

রহমান নূরকে চিনলেও নূর রহমানকে চিনতে পারলো না। কারণ তার মুখেও ছিলো আবরণ। নিচের অংশ ছিলো পাগড়ির আঁচলে ঢাকা।

নূরী যখন খাবার নিয়ে বন্দীশালায় প্রবেশ করছিলো তখন আড়াল থেকে রহমান সব লক্ষ্য করছিলো। রহমান জানে একমাত্র নূরীই তাকে খাওয়াতে পারবে।

নূরী কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার পর রহমানও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঐ স্থান ত্যাগ করেছিলো।

নূর ভাবছিলো কে এই মহিলা যার হৃদয়ে এত দয়ামায়া। নিশ্চয়ই এই দস্যুদলের লোক সে.....নানা চিন্তার মধ্যে নূর এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো।

হঠাৎ শব্দ কানে যেতেই সজাগ হয়ে সোজা হয়ে বসলো এবং দ্রুত হস্তে সে জুতোর গোড়ালির মধ্য হতে ক্ষুদে ওয়্যারলেসটা বের করে পীরশমহলকে জানিয়ে দিলো। রাত এখন কত জানি না, আমার কারাকক্ষে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হয়তো আমাকে ওরা হত্যা করার জন্য কারাকক্ষে প্রবেশ করলো। হয়তো মৃত্যুকেই সাদরে বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণ আমি নিজকে রক্ষার চেষ্টা করবো—তবে যদি নিজকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে—আমার—মাকে—

কথা শেষ করতে পারলো না নূর, অন্ধকারে কে যেন তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

নূর দ্রুত জুতো পরে নিলো পায়ে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সেই সুন্দর মিষ্ট কণ্ঠস্বর—নূর, এক মুহূর্ত বিলম্ব করোনা, বেরিয়ে যাও। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।

সেই নারীকণ্ঠ যে তাকে জোর করে খাবার খাইয়ে তবে ছেড়েছিলো। কে এই নারী যে তাকে গভীর রাতে কারাকক্ষ থেকে মুক্ত করে দিতে এসেছে...তারপর নার নাম ধরে বলছে। তার নাম সে জানলো কি করে! কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে।

বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই।

নূর উঠে দাঁড়ালো।

আধো অন্ধকারে তার সম্মুখে দন্ডায়মান নারীমূর্তি। যদিও তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু নূর বেশ বুঝতে পারছে নারীমূর্তি অন্য কেউ নয় যে মহিলা তাকে খাবার খাইয়ে রেখে গিয়েছিলো এ সেই মহিলা।: ওকে বিশ্বাস করতে পারলো নূর।

নারীমূর্তি যে নূরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নূর উঠে দাঁড়াতেই নারীমূর্তি বললো—তোমার চোখে কালো কাপড় বেঁধে দেবো।

নূর বিনা দ্বিধায় মাথাটা নিচু করলো নূরীর সম্মুখে।

কালো রুমালখানা নূরের চোখে বাঁধতে গিয়ে দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এলো নূরীর। একদিন ছোটশিশু নূরকে বুকে চেপে নিজের দুঃখব্যথা ভুলেছিলো, নূরকে সে নিজ সন্তানের মত আদরযত্ন করেছিলো। এক মুহূর্ত নূরকে না দেখলে তার মন অস্থির হয়ে উঠতো। সেই নূর আজ কত বড় হয়েছে....

নূরী ওর চোখে রুমাল বাঁধা শেষ করে হাতের পিঠে নিজের চোখের পানি মুছে নিলো, তারপর বললো—আমার হাত ধরো।

নূর হাত বাড়িয়ে দিলো।

নূর শুনতে পেলো পেছনে কারাকক্ষের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

নূরীর হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তরুণ ডিটেকটিভ নূরুজ্জামান চৌধুরী। কিছুক্ষণ পূর্বেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো সে। যদিও মৃত্যুকে নূর সানন্দে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলোনা তবুও মৃত্যু আসতে পারে তাই তাকে কতকটা সজাগ হতে হয়েছিলো।

নূর কোনো প্রতিবাদ করে না, সে নূরীর হাত ধরে বেরিয়ে আসে বাইরে। একেবারে সুরঙ্গপথ দিয়ে অন্য একদিকে।

নূরীর কথামত সুরঙ্গমুখে অপেক্ষা করছিলো দু'টি অশ্ব। দু'জন অনুচর অশ্বের লাগাম ধরে রেখেছিলো।

অশ্ব দু'টির একটিতে নূর অপরটিতে উঠে বসলো নূরী।

তারপর বললো নূরী অনুচরদ্বয়কে—তোমরা সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে ফিরে যাও। কেউ যেন জানতে না পারে আমরা এই পথে বেরিয়ে গেছি।

কুর্ণিশ জানিয়ে বললো অনুচরদ্বয়ের একজন—আচ্ছা রাণীজী!

অনুচরের কথাটা কানে গেলো নূরের, কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে কিন্তু চোখ দু'টো কালো কাপড়ে বাঁধা থাকায় এবং মুখমন্ডল রাতের অন্ধকারে অস্পষ্ট হওয়ায় নূর তা দেখতে বা বুঝতে পারলো না।

নূরী অশ্বের লাগাম ধরে রাখলো। বললো—নূর, তোমাকে মুক্ত করে দিতে চলেছি। অহেতুক পালাতে বা কোনো চালাকি করতে যেও না, তাহলে বিপদে পড়বে!

বললো নূর—আগে বলো তুমি কে? আর কি করেই বা আমার নাম জানলে?

নূরী বললো—আজ নয়, আবার যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় সেদিন সব কথা জানতে পারবে।

নূর আর কোনো প্রশ্ন করলো না। কারণ নূরীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা তেজদীপ্ত ভাবছিলো যার জন্য নূরের বুঝতে বাকি রইলো না এর বেশি ওর কাছে আজ আর কিছু জানতে পারবে না।

বহু দূরে এসে পড়েছে তারা।

গভীর জঙ্গল পেরিয়ে এক নির্জন প্রান্তরে।

চারিদিকে জনপ্রাণীর কোনো চিহ্ন নেই।

পূর্বাকাশ সবেমাত্র ফর্সা হতে চলেছে।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো নূরী, তারপর নূরকে সে হাত বাড়িয়ে নামিয়ে নিলো।

খুলে দিলো ওর চোখের বাঁধন।

নূর ভোরের আলোতে স্পষ্ট দেখলো নূরীকে।

জমকালো পরিচ্ছদে আবৃত তার দেহ। শুধু মুখমন্ডল অনাবৃত। শুভ্র সুন্দর কোমল একটি মুখ সে মুখে মাতৃসুলভ ভাব ফুটে উঠেছে। উজ্জ্বল দীপ্ত দুটি চোখে মায়াভরা দৃষ্টি।

নূরের মন শ্রদ্ধায় নত হয়ে এলো, মনে তার প্রশ্ন—কে এই দয়াবতী রমণী?

নূরকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললো নূরী—যাও আর বিলম্ব করো না। তুমি চলে যাও নূর...হাঁ, এই অশ্বটি তুমি নিয়ে যাও কিন্তু শহরের বাইরে ওকে রেখে তুমি চলে যেও।

নূর ভাবছে এ একটি নারী—একে কাবু করা মোটেই কঠিন নয়। বরং বন্দী করে সে নিয়ে যেতে পারে। এক্ষুণি জুতোর গোড়ালি খুলে সংবাদ দিতে পারে পুলিশ অফিসে। পুলিশবাহিনী সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে এসে

পড়বে এবং এই মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে পুলিশ অফিসে। এর মুখ থেকেই বের করে নেওয়া যেতে পারে বনহুরের আস্তানার পথের সন্ধান....

নূরী হেসে বললো—জানি তুমি কি ভাবছো। কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়, কারণ তুমি জানোনা বনহুরের আস্তানা খুঁজে বের করা কারও সাধ্য নয়। অহেতুক প্রাণ ক্ষয় হবে।

নূর অবাক হলো, আশ্চর্য মহিলা তার অন্তরের কথা সে কি করে জানতে পারলো। আর বিলম্ব না করে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো সে।

অশ্বপৃষ্ঠে বসে একবার সে ফিরে তাকালো নূরীর দিকে।

নূরীর দু'চোখ পানিতে ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু সে নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে ওর দিকে! যেন কতদিনের হারানো রত্নকে সে ফিরে পেয়েছিলো, আবার হারাতে যাচ্ছে।

নূর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

নূরী চেপে বসলো তার অশ্বপৃষ্ঠে।

আস্তানায় প্রবেশ করতেই জাভেদ পথ আগলে দাঁড়ালো।

নূরী চমকে মুখ তুললো।

জাভেদ কঠিন কণ্ঠে বললো—আম্মু, তুমি তাহলে

হাঁ, আমিই নূরকে মুক্ত করে দিয়ে এলাম।

আম্মু!

হাঁ জাভেদ।

জাভেদের চোখ দুটো দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হলো। সে ভীষণ হুঙ্কার ছেড়ে বললো—আম্মু, তুমি এ কাজ করতে গেলে কেন? আর ওর নামই বা তুমি জানলে কেমন করে?

জাভেদ পথ ছাড়ো, আমি কোনো কথার জবাব দেবো না।

দিতে হবে।

না।

আম্মু ও আমাদের চরম শত্রু।

জানি।

তবু তুমি?

হাঁ।

শুধু হাঁ বলো না, জবাব দাও।

দেবো না।

আম্মু, তুমি আমার জন্মদাত্রী মা, তাই এখনও তুমি জীবিত আছো, নইলে...

রিভলভার চেপে ধরলো জাভেদ নূরীর বুকে।

এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ালো বনহুর, বললো—জাভেদ!

না, আমি জানতে চাই কেন আম্মু আমাদের শত্রুকে নিজের হাতে মুক্ত করে দিয়ে এলো।

জবাব আমি দেবো। বললো বনহুর।

এবার জাভেদ মায়ের বুক থেকে রিভলভার সরিয়ে নিয়ে ফিরে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

নূরী সন্তানের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আস্তানার অভ্যন্তরে চলে গেলো।

জাভেদ বললো—বাপু, তুমি জানো ঐ ছোকড়া ডিটেকটিভ্ কত বড় শয়তান...

না জাভেদ, সে শয়তান নয়। বলতে পারো ভয়ংকর অথবা দুর্দান্ত। আমি জানি সে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে...

এত জেনেও তুমি আম্মুকে এ ব্যাপারে কিছু বললে না?

বলে কোনো ফল হবে না।

এ তুমি কি বলছো বাপু?

হাঁ, তোমার আম্মু যা করেছে তা মন্দ করেনি।

তুমিও কি তাহলে...

তরুণ ডিটেকটিভ, তাকে সুযোগ দিতে হবে বৈকি...

বাপু!

নতুন সূর্যকে উদয় হতে দাও জাভেদ।

নতুন সূর্য! কে নতুন? ঐ গোয়েন্দা বাদমাইসটা? যার নাম শুনলে আমরা পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করে। আজ রাতে ওকে হত্যা করবো ভেবেছিলাম।

জাভেদ, মানুষ হত্যা করা মহাপাপ।

বাপু, তোমার মুখে এ কথা?

কেন, আমার মুখে এ কথা শুনে অবাক হচ্ছিস কেন?

তুমি মানুষ হত্যা করোনি বলতে চাও?

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর—মানুষ আমি হত্যা করিনি কোনোদিন।

বাপু, জানতাম তুমি দস্যু হলেও মিথ্যা কথা বলোনা কোনোদিন।

হাঁ—আমি আজও মিথ্যা কথা বলিনি।

বাপু, আজ পর্যন্ত কত শত মানুষকে তুমি হত্যা করেছো, তা আমার অজানা নেই।

জাভেদ, তুমি যাদের মানুষ বলে হিসেবের তালিকায় সন্ধান করছো তারা মানুষ নয়।

মানুষ নয়?

না।

তবে কি তারা?

পশু!

পশু?

হাঁ।

বাপু, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

শোনো জাভেদ, আমি যাদের হত্যা করেছি তারা অমানুষ জানোয়ারের চেয়েও হীন জঘন্য। দাঁতে দাঁত পিষলো বনহুর।

জাভেদ তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

বললো বনহুর পুনরায়—মানুষের রূপ নিয়ে যে সব মানুষ নিরীহ জনগণের বুকের রক্ত চুষে খায় আমি সেইসব অমানুষকে হত্যা করেছি। যাকে তুমি আজ হত্যা করতে যাচ্ছিলে সে এইসব অমানুষের লিষ্টে পড়ে না।

বাপু, তুমি যাই বলো আমি ঐ ডিটেকটিভটাকে দেখে নেবো। কেমন গোয়েন্দা সে...কথাটা বলে দ্রুত চলে গেলো জাভেদ আস্তানার বাইরে।

জাভেদের অশ্ব অদূরে বাঁধা ছিলো।

জাভেদ যেমন তার অশ্বপৃষ্ঠে চাপতে যাবে, অমনি পেছন থেকে কেউ তার পিঠে একটা ফল ছুড়ে মারলো।

চমকে ফিরে তাকালো জাভেদ।

খিল খিল করে হেসে উঠলো ফুল্লরা। তার কোচরে একরাশ বন্য ফল। একটা ফল সে খেতে খেতে ছুড়ে মেরেছিলো জাভেদকে লক্ষ্য করে।

জাভেদ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

ফুল্লরা বললো চলে যাচ্ছিস জাভেদ?

জাভেদ রাগত কণ্ঠে বললো—যাবোনা তবে কি থাকবো?

কেন, এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না তোর?

কথাটা বলে ফুল্লরা জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

জাভেদ, কোনো জবাব না দিয়েই অশ্বপৃষ্ঠে উঠতে যাচ্ছিলো, ফুল্লরা ওর জামার পেছন অংশ টেনে ধরে বললো—জবাব না দিয়ে তোকে যেতে দেবো না জাভেদ।

বাধা পেয়ে জাভেদ আরও রেগে গেলো, এক ঝটকায় ওর হাতের মুঠা থেকে জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—তোদের চেয়ে আশা আম্মু অনেক ভাল!

ওঃ সব সময় আশা আম্মু! যা যা দেখবো কতদিন ওখানে থাকতে পারিস। তোর জন্য মোটেই আর ভাবি না।

না ভাবলি তো আমার বয়েই গেলো। কথাটা বলে জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

ফুল্লরা বললো—ফল নিবি না?

বললো জাভেদ—তুই খা! তারপর অশ্ব নিয়ে চলে গেলো সে।

ফুল্লরা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর পায়ের মলে ঝংকার তুলে চলে গেলো।

❑

মিঃ নুরুজ্জামান ফিরে এসেছেন, এ সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো গোটা কাশ্মীর শহরে, যেমন তার নিরুদ্দেশ ব্যাপার ছড়িয়ে পড়েছিলো।

পুলিশমহল থেকে সবাই এলেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এমন কি মিঃ শংকর রাও স্বয়ং এলেন নুরুজ্জামান চৌধুরীর বাসায়।

সবাই বিস্ময় নিয়ে এসেছেন কি করে ফিরে এলো সে দস্যু বনহুরের আস্তানা থেকে—এই তাঁদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা।

মিঃ শংকর রাও এসে বসলেন কিন্তু তিনি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। নূরের চারপাশে ঘিরে আছেন কান্দাইয়ের সাংবাদিকগণ।

তাঁরা নানা জনে নানা প্রশ্ন করে চলেছেন।

নূর শান্তভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাঁদের প্রশ্নের জবাব ছাড়া একটা কোনো কথা সে বেশি বলছে না। পাশে বসে মিঃ শংকর রাও শুনে যাচ্ছিলো।

মিঃ শংকর রাও অতি চতুর ব্যক্তি, তিনি ভালভাবে নূরের কথাগুলো অনুধাবন করছিলেন। নূর কি জানতে পেরেছে বনহুর তার কে? একটা সন্দেহ ছিলো মিঃ শংকর রাওয়ের মনে, যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে নূরের আলাপ হচ্ছিলো তখন তিনি তার কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলেন নূর মোটেই জানতে পারেনি বনহুরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মিঃ শংকর রাও।

বয়স তাঁর কম হয়নি, বিশ বছর ধরে শংকর রাও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন দস্যু বনহুরকে তিনি গ্রেপ্তার করবেন কিন্তু আজও সফলকাম হন নি।

তখন দস্যু বনহুর তরুণ ছিলো।

বয়স ছিলো তার বাইশ অথবা চব্বিশ। এই বয়সেই বনহুর বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনে গিয়েছিলো, পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিলো তার নাম। আতঙ্কে প্রকম্পিত হয়েছিলো অসৎ ব্যক্তিদের হৃদয়।

আজও বনহুরের নামে শিউরে উঠে দেশের এবং জনগণের অমঙ্গল সাধনে সচেষ্ট স্বার্থান্বেষী দল।

শংকর রাও সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় স্থির হয়ে আছে নূরের মুখের দিকে।

এক সময় সাংবাদিকমহল নূরকে ছুটি দিয়ে চলে গেলো।

মুক্তি পেলো নূর।

মিঃ শংকর রাও এবার হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাস্ট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন—মিঃ চৌধুরী!

বলুন?

মিঃ শংকর রাও নূরকে মিঃ চৌধুরী বলে ডাকতেন।

মিঃ শংকর রাওকে সোজা হয়ে বসতে দেখে নূর বুঝে নিয়েছিলো সাংবাদিকদের কাছ থেকে সে নিস্কৃতি পেলেও মিঃ শংকর রাওয়ের কাছ থেকে মুক্তি পায়নি এখনও।

নূরের মনটা অবশ্য ছটফট করছিলো কখন সে মায়ের কাছে যাবে। মা ও দাদীমাকে না দেখা পর্যন্ত যেন স্বস্তি ছিলো না তার।

তবু মনের গোপন কথা মনে চেপে সবার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো। সে নিজেই বিস্মিত, দস্যু বনহুরের বন্দীশালা থেকে কি করে মুক্ত হলো?

সাংবাদিকমহল বিদায় নিতেই শংকর রাও বললেন—মিঃ চৌধুরী, এবার আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো যদিও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আপনি সব কথাই ব্যক্ত করেছেন।

বলুন মিঃ রাও?

নূরের কণ্ঠস্বরে শংকর রাও যেন চমকে উঠলেন। এই কণ্ঠ যেন তিনি বিশ বছর পূর্বেও শুনেছিলেন। মিঃ রাও মিঃ রাও মিঃ রাও একদিন গভীর রাতে শংকর রাও তাঁর বাংলোয় ক্রুদ্ধ ভাবে পায়চারী করছিলো। তাঁর মাথার রগগুলো যেন টন্‌টন্ করছিলো সেদিন, কারণ দস্যু বনহুর তাকে কৌশলে বাক্সে বন্দী করে তারই বাসায় মাল হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। মিসেস রাও মনে করেছিলেন, হয়তো বা তার স্বামী নতুন বাক্সটা কিনে কোনো শৌখিন জিনিস সহ বাসায় পাঠিয়েছেন।

মিসেস রাও চাকরকে বললেন—বাক্সটা খুলে তার মধ্যে কি জিনিসপত্র আছে ঝটপট বের কর।

বেগম সাহেবার নির্দেশ পেয়ে বাড়ির দারোয়ান এবং বয়-বাবুর্চি, চাকর-বাকর সবাই এসে বাক্সটা ঘিরে ধরলো, না জানি সাহেব এত বড় বাক্সটার মধ্যে কি জিনিস কিনে পাঠিয়েছেন।

বেগম সাহেবার মনে আনন্দ ধরছে না, এত বড় বাক্স। তারপর ভারী সুন্দর কিন্তু বাক্সটা। বেগম সাহেবার যেন বিলম্ব সইছে না।

তাড়াতাড়ি বাক্সটা খুলে ফেলার জন্য বললেন মিসেস রাও।

বাক্সটা এবার খুলে ফেলা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস রাও আর্তনাদ করে উঠলেন—ওগো, তোমার একি অবস্থা!

সবাই অবাক হয়ে দেখলো নতুন বাক্সটার মধ্যে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন মিঃ শংকর রাও।

শংকর রাও কিন্তু সংজ্ঞা হারাননি!

তাঁর হাত-পা এবং মুখের বাঁধন খুলে দিতেই তিনি চিৎকার করে বললেন—আমি শপথ করছি দস্যু বনহুরকে আমি শায়েস্তা না করে ছাড়বো না কিন্তু মুখে শপথ গ্রহণ করলেও কাজে সক্ষম হলেন না।

সেদিন সমস্ত রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না—এতবড় অপমান! স্ত্রী চাকর-বাকরের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জায় মাথা কাটা যেতো। খেতে বসেও খেতে পারতেন না। সমস্ত শরীরে যেন কেউ আগুন জ্বেলে দিয়েছিলো।

রাতে খোলা বারান্দায় পায়চারী করতেন।

রাগে গম্‌গম্ করতো তাঁর শরীর।

দস্যু বনহুরকে পেলে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুরকে দিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়বেন, নাহলে তাঁর শান্তি নেই। দাঁতে অধর দংশন করছিলেন আর পায়চারী করছিলেন, ঠিক এমন সময় কেউ যেন তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালো। গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—মিঃ রাও।

চমকে ফিরে তাকিয়ে থ' হয়ে গিয়েছিলো।

স্বয়ং দস্যু বনহুর দাঁড়িয়ে তাঁর পেছনে।

আজ শংকর রাও নূরের কণ্ঠস্বরে সেই সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন। হঠাৎ করে শংকর রাও চলে গেলেন অনেক পেছনে ফেলে আসা দিনে...

কি ভাবছেন মিঃ রাও?

তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বললেন—আমি বিস্মিত হচ্ছি মহিলাটি হঠাৎ আপনাকে এভাবে মুক্তি দিলো কেন?

আমি নিজেও এ কথা ভাবছি মিঃ রাও, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, মেয়েটাকে কি ঐ দলের বলে মনে হচ্ছিলো, না সেও কোনো বন্দিনী?

এক কথায় বোঝা যায় সে বন্দিনী বা বাইরের মহিলা নয়, কারণ তার কার্যকলাপে বোঝা যাচ্ছিলো সে ঐ দলের।

এমনও তো হতে পারে সে দস্যু বনহুরের বন্দিনী কিন্তু এখন সে প্রেমিকায় রূপান্তরিত হয়েছে?

সে কথা আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। তবে বনহুরকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় সে এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ...

মিঃ রাও ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন—আপনি কতটুকুই বা তাকে দেখেছেন। তার আসল রূপ আপনি জানেন না।

আমি যতটুকু জানি তাতেই আমার যতটুকু মনে হচ্ছে তাই বলছি।

বনহুর যে একজন ভীষণ ভয়ংকর দস্যু এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আমিও না।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, কোনোক্রমেই কি আপনি সেই পথ খুঁজে পাবেন না?

সম্ভব নয়, কারণ যে পথে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সে পথ আমার অপরিচিত। আমি কতবার ঐ পথে কান্দাই জঙ্গলে শিকার করতে গেছি, কত পশুপাখি আমি শিকার করে এনেছি কিন্তু কই এমন কোনো বা সুড়ঙ্গমুখ আমার নজরে পড়েনি। তবে হাঁ, আমি আবার সন্ধান নিয়ে দেখবো কোনো পথের খোঁজ পাই কিনা।

মিঃ চৌধুরী, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সহায়তা করবো।

জানি আপনি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাকে আপনি সব সময় সাহায্যে করবেন তাও জানি। মিঃ রাও, আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে চাই কিন্তু...

বলুন থামলেন কেন?

তার আস্তানার উপর আমি হামলা চালাতে চাই না, কারণ দস্যু বনহুরের আস্তানায় এমন একজন আছেন যিনি আমার মায়ের মত—

শংকর রাও বললেন—আমরা হামলা চালালেও কোনো নারীর উপর মন্দ আচরণ করবো না।

শংকর রাও আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করলেন।

❑

নূর গাড়ি রেখে ছুটে গেলো সিঁড়ি বেয়ে উপরে।

এক একবারে দু'তিনটে ধাপ অতিক্রম করে তার মায়ের ঘরে পৌঁছে গেলো।

মনিরা যখন নামাজ শেষ করে মোনাজাত করছিলো। পুত্রের ফিরে আসার সংবাদ তার কানে পৌঁছে গিয়েছিলো। তাই মনিরা প্রাণভরে খোদার নিকট শুকরিয়া করছিলো।

মোনাজাত শেষ করে পুত্রের হাতখানা গলার সঙ্গে চেপে ধরলো মনিরা—হঠাৎ এমন করে রাতের অন্ধকারে কোথায় গিয়েছিলে নূর?

দস্যু বনহুরের আস্তানায়।

মনিরা চমকে উঠলো না, কারণ সে শুনেছিলো সবকিছু। তাই বললো—সেখানে কেমন করে গেলি তুই?

সব বলবো। দাদীমা কই আম্মি?

এই তো আমি এসেছি। দাদুর পায়ের শব্দ কি আমার কানে যায়নি। জানতাম তুই আসবি।

তাই তো তোমরা যাওনি? নূর মায়ের কণ্ঠদেশ মুক্ত করে দিয়ে দাদীকে জড়িয়ে ধরলো তারপর দাদীর গালে গালটা স্পর্শ করে বললো—দাদীমা, জীবনে বেঁচে এসেছি নইলে আর কোনোদিন তোমাদের মুখ দেখতে পেতাম না।

বললেন মরিয়ম বেগম—দস্যু বনহুর বুঝি তোকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো।

সে বন্দী করে নিয়ে যায়নি, তারই এক অনুচর আমার বেডরুমে প্রবেশ করে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলো তাই আমি তাকে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বলিস কি নূর!

হাঁ দাদীমা।

বনহুরের অনুচর তোর বেডরুমে প্রবেশ করেছিলো। এত দুঃসাহস তার?

শুধু দুঃসাহস নয়, সে আমাকে অপমানসূচক কথা বলেছে। আম্মি, সে এক বিস্ময়কর কাহিনী!

মনিরা কিন্তু কোনো জবাব দিচ্ছিলো না।

মরিয়ম বেগম কথা বলছিলেন।

নূর বলছে—দাদীমা, বনহুরের বন্দীশালা মানে যমপুরী, বুঝলে?

জানি সেখানে তোর খুব কষ্ট হয়েছে। তোর উপরে তারা নির্যাতন চালিয়েছে.....

না দাদী আম্মি, মোটেই তা নয়।

তার মানে?

মানে আমিই মুখে দেইনি কিছু।

কারণ?

কারণ মরতে যখন হবেই তখন খেয়ে লাভ কি, তাই বন্দীশালায় বসে বসে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম।

তারপর?

ঐ রাতে আমাকে হত্যা করা হবে, এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

সত্যি? দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা ওপাশে খাটের উপর বসে পড়ে শুনছে বৃদ্ধা শাশুড়ি এবং পুত্রের কথাগুলো।

বললো নূর—হাঁ, আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আমি সে কারণে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম।

বলিস কি নূর।

হাঁ দাদী আম্মি...নূর কখনও দাদী আম্মি কখনও দাদীমা বলতো, কারণ দাদীমা ছিলো তার আদরের ডাক। কখনও কখনও দাদুও বলতো সে দাদীকে।

নূর এবার বলে চলে—আমি যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি তখন হঠাৎ কারাকক্ষের দরজা খুলে গেলো।

আমি সজাগ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু দেখলাম খর্গ হাতে দস্যু বনহুর বা তার অনুচর নয়—এক নারীমূর্তি। সোজা হয়ে বসলাম, কিছুটা বিস্ময় নিয়ে দেখছি।

কারাকক্ষ বেশ অন্ধকার।

দূরে কোথাও মশাল জ্বলছে, তারই অস্পষ্ট আলোতে দেখলাম নারীমূর্তি একজন নয় দু'জন। পেছনে যে তার হাতে খাবারের থালা।

নারীমূর্তি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

প্রথম বললো—খাওনি কেন সারাদিন? নাও খেয়ে নাও নূর...

জানো আম্মি, জানো দাদীমা, আমি একেবারে অবাক। দস্যু বনহুরের আস্তানার কেউ আমার নাম ধরে ডাকবে এ আমি ভাবতে পারিনি।

এবার মনিরা উঠে এলো পুত্রের পাশে।

নূর তখনও বলে চলেছে—মায়াভরা সে কণ্ঠ, তার স্নেহভরা আদেশ পালনে বাধ্য হলাম।

তুই খেলি ঐ বিষযুক্ত খাবার? বললো মনিরা।

না আম্মি, ঐ খাবার বিষযুক্ত ছিলো না। আম্মি, জানতাম অমন যার কণ্ঠস্বর সে কোনোদিন বিষ দিতে পারে না। সত্যি আমি তাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করি।

মনিরা রাগত কণ্ঠে বলে উঠে—না, তা হতে পারে না। দস্যুর আস্তানায় কোনো হৃদয়বান নারী থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই সে কোনো মায়াবিনী.....

আম্মি, তুমি ভুল বলছো। তোমার ছেলে এখন কচি খোকা নেই। সে মানুষ চিনতে ভুল করে না। সেই হৃদয়বান মহিলাই তো আমাকে সদ্য মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

আমি বিশ্বাস করি না।

তুমি তাকে দেখোনি, দেখলে অবাক হতে। আমি তাকে অন্ধকার কারাকক্ষ ছাড়াও ভোরের আলোতে দেখেছি। সে এক মাতৃমুখ, যার তুলনা হয় না।

নূর!

আম্মি বিশ্বাস করো সে তোমার সন্তানের জীবনদায়িনী।

আমি বিশ্বাস করি না। সে রাক্ষসী, সে তার মায়াজাল বিস্তার করে সবাইকে গ্রাস করেছে।

আম্মি, তুমি তাকে চেনো?

না, আমি তাকে চিনবো কি করে? আমি তাকে চিনবো কেন? কথাগুলো শেষ করতে গিয়ে কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার।

বললেন মরিয়ম বেগম—নূর, তুই ওর কথায় কান দিস্‌নে দাদু। আমি জানি মেয়েদের হৃদয় সব সময় মায়াভরা হয়। দয়া স্নেহ মায়া মমতা নিয়েই যে নারীজন্ম...

তুমি ঠিক বলেছো দাদীমা, আমি জানি তোমরা নারীজাতি দয়াবতী. আমি তাই শ্রদ্ধা করি নারীজাতিকে।

মনিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলো মরিয়ম বেগম বললেন—বৌমা, তোমার সন্তানের যে জীবন বাঁচিয়েছে তার প্রতি তোমার করুণা থাকা দরকার।

রাতে নূর ঘুমাতে গিয়েও বারবার মা ও দাদীমার কথাগুলো নিয়েই ভাবছিলো, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিলো সবকিছু।

হঠাৎ আম্মি এমন ক্ষিপ্তা হয়ে উঠলেন কেন সেই নারীটির কথায়? আম্মি কি তাহলে চেনেন তাকে। না, তা কেমন করে হয়। দস্যু বনহুরের আস্তানায় সেই মহিলা আর তার মা কান্দাই শহরে। যে বাড়ির সঙ্গে কোনো সাধারণ বাড়ির বা ব্যক্তির কোনো সম্বন্ধ নেই।

অনেক কথা ভাবলো নূর কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না।

কয়েক দিন কেটে গেলো।

নূর কিন্তু কোনো সময় ভুলতে পারেনি সেই মহিলার কথা। বনহুরের বন্দীশালায় যে তাকে মায়ের স্নেহে তার হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিলো।

সেদিন সবার অলক্ষ্যে নূর তার গাড়ি নিয়ে হাজির হলো কান্দাই জঙ্গলের ধারে।

গাড়িখানা পথের ধারে রেখে সে কিছুটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো। নূরের পিঠে গুলীভরা রাইফেল, সে শিকারের ছলনায় এসেছে। তার ইচ্ছা শিকারের চেয়ে সেই মাতৃহৃদয় সম্পন্না মহিলার দর্শন লাভ করা।

একটু একটু করে বেশ ভিতরে প্রবেশ করলো নূর। হঠাৎ তার নজরে পড়লো অদূরে একটা জলাশয়ে পানি পান করছে একটা হরিণ।

ভারী সুন্দর হরিণটা।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে রাইফেল তুলে ধরে হরিণটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। ঠিক তক্ষুণি হরিণটির দেহে এসে বিদ্ধ হলো একটা তীরফলক। ঠিক একই মুহূর্তে হরিণটার দেহে গুলী এবং তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো।

নূর আশ্চর্য হলো, তবু সে এগিয়ে চললো জলাশয়ের ধারে লুটিয়ে পড়া হরিণটার দিকে।

কয়েক পা অগ্রসর হতেই নূর চমকে উঠলো, সে দেখলো এক অশ্বারোহী তরুণী হাতে তার তীর-ধনু এগিয়ে আসছে হরিণটার দিকে।

নূর কিছু বলবার পূর্বেই নেমে দাঁড়ালো তরুণী তার অশ্ব থেকে।

নূর কিছু বলবার পূর্বেই বললো তরুণী—হরিণ আমি শিকার করেছি।

এবার নূর বললো—না হরিণ আমি শিকার করেছি।

তরুণী রাগতভাবে এগিয়ে গিয়ে হরিণটার পাশে দাঁড়িয়ে বললো—দেখছোনা হরিণের দেহে আমার নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয়ে আছে?

বললো নূর—তুমি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখো হরিণটার দেহে রাইফেলের গুলী বিদ্ধ হয়েছে। আমার গুলী বিদ্ধ হওয়ার হরিটার মৃত্যু ঘটেছে...

কিছুতেই তা মেনে নিতে পারি না, আমার তীর বিদ্ধ হওয়ায় হরিণটার মৃত্যু ঘটেছে...

নূর আর তরুণীর মধ্যে বেশ একটা ঝগড়া সৃষ্টি হলো।

বাধ্য হলো নূর তরুণীর কথা মেনে নিতে শেষ পর্যন্ত। কারণ তরুণী জোর করে হরিণটা তুলে নিলো তার অশ্বপৃষ্ঠে। একটা হরিণ নিয়ে গন্ডগোল করাটা সমীচীন মনে করলো না নূর।

কিন্তু মনে মনে সে নিজকে পরাজিত মনে করলো।

কে এই তরুণী যার কোনো পরিচয় সে জানে না, তার কাছে সে হার স্বীকার করে নেবে না, তা সে মেনে নেবে না।

বললো নূর—জানো ঐ হরিণটা আমি তোমাকে করুণা করে দিলাম তবে তোমার পরিচয় আমাকে দিতে হবে।

করুণার দান ফুল্লরা গ্রহণ করে না। ও হরিণ আমি শিকার করেছি, তাই আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ও, তোমার নাম তাহলে ফুল্লরা। চমৎকার নামটা তোমার। বললো নূর।

তরুণী ততক্ষণে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে।

নূর অবাক হয়ে দেখছে, কে এই তরুণী যার এত সাহস।

নূর যখন ওকে নিয়ে ভাবছে তখন তরুণী ফুল্লরা হরিণসহ তার অশ্ব নিয়ে গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়েছে।

নূর বিস্ময় নিয়ে তখনও তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি এত সুন্দর তরুণী এর পূর্বে নূরের চোখে পড়েনি। উচ্ছল ঝরণার মত ওর গতি, সুন্দর কথা বলার ভঙ্গী, গোলাপী রং যেন উপচে পড়ছে তার দেহে। ডাগর ডাগর দু'টি চোখ, উজ্জ্বল দ্বীপ্ত।

ওকে নূরের বড্ড ভাল লাগলো।

ওর কাছে পরাজয় প্রথমে লজ্জাকর মনে হলেও পরের দিকে বেশ মধুময় মনে হলো।

নূর অন্যমনস্কভাবে ফিরে চললো তার গাড়ির দিকে।

❑

বাসায় ফিরেও নূরের মন থেকে ফুল্লার স্মৃতি মুছে গেলো না। নামটা সে বারবার উচ্চারণ করে মুখস্থ করে নিলো ফুল্লরা—ফু...ল্ল...রা

নতুন নাম...বড় মিষ্টি আর সুন্দর নাম। ঐ নামটা কেন যেন তার মনে গেঁথে গেলো।

একটা আকর্ষণ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঐ বনে যাবার জন্য মন তার চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে তারপর।

প্রতিদিন ভেবেছে আবার যাবে নূর কিন্তু কেন যেন সে যেতে পারে না, একটা বাধা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। রাতে ঘুম হয় না, চোখে মুদলেই সেই অজ্ঞাত তরুণীর মুখখানা ভেসে উঠে চোখের সামনে। ঘাগ্‌ড়া পরা একটা মেয়ে। পায়ে মল, হাতে বালা, কানে বালা। চুলগুলো দুটো বিনুনী করা, চোখে কাজলের রেখা কপালে চন্দনের টিপ্—আপন মনে বলে উঠে নূর—অপূর্ব!

শয্যা ভাল লাগলো না, গভীর রাতেই মন ছুটে যেতে চায় সেই জঙ্গলের ধারে।

পায়চারী করে।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলে নূর। এ্যাসট্রে ভর্তি হয়ে যায়।

সকালে বয় অবাক হয়, এত সিগারেট সাহেব পান করেছেন— তাহলে ঘুমান তিনি কখন?

সেদিন মনিরা এসে হাজির হলো পুত্রের বাসভবনে।

সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন চৌধুরীবাড়িতে যায় দাদীমা ও আম্মির সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেলো নূর যায়নি।

মনিরার মন সন্তানের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, তাই সে ছুটে এসেছে সন্তানের বাসায়।

হাজার হলে মায়ের মন তো, হঠাৎ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছিলো।

এসেই নূরকে সম্মুখে পেয়ে বললো—একবারও বাড়ির কথা মনে করলে না।

আম্মি মাফ করে দাও, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম তাই

আমি সব শুনেছি।

কি শুনেছো আম্মি? অবাক কণ্ঠে বললো নূর। মনে তার সন্দেহ জাগলো তবে কি তার আম্মি তার মনের কথা জেনে নিয়েছেন। না, তা জানবেন কি করে, সে তো কাউকে বলেনি তার মনের কথা।

যা হচ্ছে বা হয়েছে সে সব নিজে একা জানে, কাউকে সে আজও জানায়নি সে কথা।

মনিরা বললো—আমি আলীর মুখে সব শুনেছি।

আলী! আলীর মুখে সব শুনেছো? একরাশ বিস্ময় নিয়ে বললো নূর।

আলী এ বাড়ির চাকর।

অবশ্য তাকে মনিরাই এ বাড়িতে রেখেছে শুধু নূরের প্রতি যত্ন এবং খেয়াল নেবার জন্য। কখন সে ঘুমালো, কখন সে বাইরে গেলো সব লক্ষ্য করবে আলী এবং সপ্তাহ পর এ সংবাদ সঠিকভাবে পৌঁছিয়ে দেবে সে চৌধুরী বাড়িতে। একটিমাত্র সন্তান মনিরার—নয়নের মণি হৃদয়ের ধন। শুধু মনিরাই নয়, মরিয়ম বেগমও নূরকে জানের চেয়ে বেশি ভালবাসেন, কারণ সন্তানকে তিনি সর্বক্ষণের জন্য পাশে পাননি। তাই নাতিকে তিনি দৃষ্টির আড়াল হতে দিতে চান না।

আলীকে তাই বধূ এবং শাশুড়ি মিলে নূরের বাসায় রেখেছেন যেন সে নূরের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে।

নূর মায়ের কথায় অবাক হয়ে বললো—আলীর মুখে সব শুনেছো তার মানে?

আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন মরিয়ম বেগম, বললেন—শুধু আলীর মুখে শুনিনি, আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি।

এসব কি বলছো তোমরা শাশুড়ি আর বউ মিলে?

যা সত্যি তাই বলছি। বললেন মরিয়ম বেগম।

নূর নির্বাক হয়ে পড়লো যেন। হঠাৎ অসময়ে মা ও দাদীমাকে তার বাসভবনে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে, তারপর তাঁদের কথাবার্তা যেন হেঁয়ালিপূর্ণ লাগছে। তার মনের কথা তারা জানলেন কি করে?

বললো নূর—বলো কি সত্যি! আমি তোমাদের কোনো কথা এখনও বুঝতে পারছি না।

বললো মনিরা—তা বুঝবে কেন, মনে করেছো আমরা কিছু জানি না। দেখো নূর, তুমি আলাদা বাসায় থাকলেও আমাদের কাছে তুমি কিছু লুকাতে পারবে না।

আম্মি!

শোন, তুমি মনে করেছো বেশ বড় হয়ে গেছো?

না আম্মি, আমি সেই কচি খোকাটিই রয়ে গেছি।

নূর, এই বয়সে এত ইঁচড়ে পাকা ভাল নয়, বুঝলি? বললেন মরিয়ম বেগম।

কি করেছি বলবে তো?

বৌমা, তুমি যাও আমি সব বলছি।

মনিরা চলে গেলো পাশের ঘরে।

মরিয়ম বেগম এতক্ষণে আঁচল সরিয়ে নিয়ে বলেন—বল্ এগুলো কি?

নূর অবাক হয়ে দেখলো দাদীমার হাতে এ্যাসট্রে, তার মধ্যে স্তূপাকার অর্ধগদ্ধ সিগারেটের টুকরা।

নূর এতক্ষণে সব বুঝতে পারলো, হেসে দাদীর হাত থেকে এ্যাসট্রেটা হাতে নিয়ে টেবিলের নিচে আড়ালে লুকিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো—বেটা আলী এইসব তোমাদের দেখিয়েছে।

বললেন মরিয়ম বেগম—ওকে আমরা রেখেছি যে কারণে সেই কারণটা তো জানাবেই।

আমি মজাটা কেমন দেখিয়ে দেবো। বারোটা ওর বাজিয়ে ছাড়বো। বললো নূর।

মরিয়ম বেগম বললেন—রাতে ঘুমাও না, সারারাত সিগারেট পান করো। নাওয়া খাওয়া ঠিকমত করোনা...

এসব আলী তোমাদের বলেছে!

বলবেই তো?

নূর যেন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, যা হোক এই কথা। তার মনের কথা কেউ জানে না। নূর হেসে বললো—দাদীমা, তোমরা কিছু ভেবো না, আমি তোমাদের আলীর মেহেরবানিতে ঠিক মতই আছি বা থাকবো।

এবার উচ্চকণ্ঠে শিশুর মত ডাকতে থাকে নূর—আম্মি! আম্মি! এ ঘরে এসো...এতক্ষণে নূর যেন স্বাভাবিক হলো।

মনিরা এসে হাজির হলো এ ঘরে।

কিছুক্ষণ চললো নানা ধরনের কথাবার্তা। তারপর বিদায়ের পালা।

মনিরা আর মরিয়ম বেগম বারবার বললেন—আর যেন শরীরের প্রতি অনিয়ম করা না হয়। যেন ঠিকমত ঘুমানো হয়। খাবার যেন ঠান্ডা হবার পূর্বেই খাওয়া হয়।

নূর সব কথায় মাথা দোলালো, তার মনে মা আর দাদীমার কথা সব সে মেনে নিয়েছে সর্বান্তকরণে।

মা আর দাদীমাকে বিদায় দিয়েই ফিরে এলো নূর নিজের ঘরে। গম্ভীর গলায় উচ্চকণ্ঠে ডাকলো—আলী—আলী—আলী—

নূরের কণ্ঠস্বরে আজ নতুন সুরের আভাস শুনতে পেয়ে আলী থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করলো।

পুনরায় ডাকলো নূর—আলী—আলী...

এবার আলী সম্মুখে হাজির না হয়ে পারলো না।

নূর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—দাদীমা আর আম্মি হঠাৎ অসময়ে কেন এসেছিলেন?

আলী ঢোক গিলে বললো—আমি নিজেও তাই ভাবছি হঠাৎ আম্মাজান আর দাদীআম্মা কেন এসেছিলেন?

নেকামির আর জায়গা পাসনি, তাই না?

ছোট সাহেব!

বের কর্ ঐ এ্যাসট্রে। আংগুল দিয়ে টেবিলের নিচে দেখিয়ে দিলো নূর।

আলী কম্পিত হাতে বের করলো এ্যাসট্রেটা।

এ্যাসট্রে হাতে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই নূর বললো—কোথায় যাচ্ছিস?

পরিষ্কার করে আনতে।

এতক্ষণে এ্যাসট্রে পরিষ্কার করতে যাচ্ছিস, কেন সকাল বেলা পরিষ্কার করতে কে মানা করেছিলো?

ছোট সাহেব...

বল থামলি কেন?

কোনো জবাব দেয় না আলী, ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো বারবার নূরের মুখের দিকে।

বললো নূর—এসব জমা করে আম্মি আর দাদীমাকে খবর দেওয়া হয়েছিলো? বল্ চুপ করে রইলি কেন?

ছোট সাহেব, এই বয়সে এত সিগারেট খাওয়া ভাল নয়, তাই—

তাই, আম্মি আর দাদীমাকে ডেকে আনতে হবে।

মাফ করে দিন ছোট সাহেব!

যা আজ মাফ করে দিলাম, এরপর আর যদি কোনোদিন—

আপনি যত খুশি সিগারেট খাবেন, বলবো না তাই তো?

কোনো কথাই আম্মি আর দাদীমার কানে দিবি না, বুঝলি?

কিন্তু—

কিন্তু কি রে?

চাকরি থাকবে না।

কেন?

আম্মাজান বলেছেন কোনো কথা গোপন করলে চাকরি যাবে। সব সময় আপনার উপর নজর রাখতে বলেছেন যেন এক মুহূর্ত বেখেয়াল না হই।

ও তাই বুঝি তুই আমাকে পাহারা দিচ্ছিস্?

হাঁ ছোট সাহেব।

কিন্তু আমি তোর চাকরি ছাঁটাই করবো।

ছোট সাহেব, বড় গরিব লোক আমি, চাকরিটা ছাঁটাই হলে বুড়ো মা আর ভাইবোনদের খাওয়াবো কি?

বেশ যদি চাকরি রাখতে চাস্ তাহলে আমি যা বলবো তাই করবি।

আচ্ছা ছোট সাহেব।

এখন যা, পরে সব বলে দেবো।

আচ্ছা ছোট সাহেব যাচ্ছি। চলে যায় আলী।

হাসে নূর, আম্মি আর দাদী তাকে কচি খোকা মনে করে আলীকে প্রহরী রেখেছেন। সোফায় হেলান দিয়ে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে সে।

সম্মুখস্থ মুক্ত জানালা দিয়ে দৃষ্টি তার চলে যায় দূরে বহুদূরে সীমাহীন ঐ নীল আকাশে। খন্ড খন্ড মেঘের আনাগোনা, তারই ফাঁকে উড়ে চলেছে নাম না জানা পাখিগুলো।

নূর অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে একটি মুখ। নিজ মনেই নামটা উচ্চারণ করে...ফুল্লরা! ভারী সুন্দর মিষ্টি নাম।

পরদিন নিজকে সংযত রাখতে পারে না নূর, ভোরে শয্যা ত্যাগ করেই চিৎকার করে ডাকে—আলী...আলী...আলী...

আলী সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো, নূরের ডাক শুনে ছুটে আসে—ছোট সাহেব আমাকে ডাকছেন।

হাঁ।

হুকুম করুন।

শোন্।

বলুন ছোটসাহেব।

শিকারে যাবো।

শি-কা-রে-!

তা অমন অবাক হচ্ছিস কেন!

ছোট সাহেব, আম্মাজানা আর দাদীআম্মা জানতে পারলে তা...

তোর কাঁধে মাথাটা থাকবে না।

ছোট সাহেব।

খবরদার, আর কোনো খবর যেন চৌধুরীবাড়ি না যায়!

কিন্তু—

আবার কিন্তু—

ছোট সাহেব তাহলে কি সত্যিই শিকারে যাবেন?

তৈরি হয়ে নে তোকে সঙ্গে যেতে হবে।

আচ্ছা! মাথাটা কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলো আলী। মনটা তার উস্‌খুস করছে সংবাদটা চৌধুরীবাড়িতে কতক্ষণে পৌছাবে।

কিন্তু সুযোগ হলো না আলীর তাই সে চটপট করে কাপড় জামা পরে নিয়ে এসে দাঁড়ালো ছোট সাহেবের পাশে।

গাড়ির নিকট পৌছে আলীকে লক্ষ্য করে বললো নূর—ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বস্ আলী।

আলী সুবোধ বালকের মত ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বসলো।

নূর বসলো ড্রাইভ আসনে।

গাড়ি ছুটলো।

আলীর মন অস্থির লাগছে, কারণ আম্মাজানের এত নিষেধ সত্ত্বেও আবার ছোট সাহেব শিকারে চললেন, না জানি কোন বিপদ সেখানে ওৎ পেতে আছে।

গাড়ির গতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

আলীর মুখচোখ বিবর্ণ হয়ে আসছে। না জানি রাইফেল নিয়ে কোথায় চলেছেন ছোট সাহেব। বলতেও পারছে না সে কিছু, কিছু বললেই ধমক লাগাবেন ছোট সাহেব।

তবু সাহস করে বললো আলী—ছোট সাহেব, শিকারে যাবেন ফিরবেন কখন?

ড্রাইভ করতে করতে বললো নূর—শিকারে না যেতেই আগে ফিরবো কখন তোকে বলতে হবে? যখন ফিরবো তখন দেখতে পাবি।

শহর ছেড়ে নির্জন পথ ধরে গাড়ি ছুটছে।

গাড়ি যত এগুচ্ছে আলীর মুখ তত শুকাচ্ছে।

ভয় বিহ্বল চোখে সে তাকাচ্ছে নূরের মুখের দিকে।

এবার বললো নূর—আলী তোকে কেন সঙ্গে এনেছি জানিস?

তা কেমন করে জানবো ছোট সাহেব?

বলছি শোন্। এখানে এলি যা দেখবি খবরদার কাউকে বলবি না।

শুধু আম্মাজান আর দাদীমা...

না, কাউকে না।

ছোট সাহেব তাহলে চাকরিটা?

আমি তোকে বেতন দেবো, আম্মি আর দাদীমাকে কিছু বলছি না। ডবল বেতন পাবি।

আচ্ছা ছোট সাহেব, এই নাক আর কান মলছি কোনো কথা তাদের বলবো না।

তাহলে চুপ করে বসে থাক্।

আচ্ছা।

গাড়িখানা নির্জন পথ পেয়ে উল্কাবেগে ছুটছে!

আলী বলে উঠলো—আর কত দূর?

বললাম তো কথা বলবি না।

আচ্ছা ছোট সাহেব।

এরপর আলী একদম নীরব হয়ে গেলো।

নূর গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

এক সময় কান্দাই জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছে গেলো নূরের গাড়িখানা।

গাড়ি রেখে নেমে পড়লো নূর।

আলীও নামতে যাচ্ছিলো, বললো নূর—চুপচাপ বসে থাকবি, খবরদার নামবি না।

রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে নূর জঙ্গলে প্রবেশ করলো। দস্যু বনহুরের সন্ধান করতে এসে কান্দাই জঙ্গলে খুঁজে পেলো তার প্রিয়ার সন্ধান।

ঐ মেয়েটা কে?

কি তার পরিচয় কিছু জানে না সে। তবু কেন এত ভাল লেগেছে তার।

নূর চারদিকে দৃষ্টি রেখে এগুচ্ছে। তার চোখ দুটো সন্ধান করে ফিরছে সেই তরুণীটিকে। নূর ভাবছে তরুণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তার বেশ কয়েকদিন আগে। এরপর আর সে আসেনি, আজ হঠাৎ করে তরুণীর সন্ধান করা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। সেদিন ঐ তরুণীও শিকারে এসেছিলো তাই তো হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিলো। আজ আবার তার সঙ্গে দেখা হবে এটা কল্পনাতীত...

নূর এসেছে।

হঠাৎ একটা বন্যশূকর ছুটে আসে নূরের দিকে। নূর রাইফেল উঁচু করে বন্য শূকরটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

গুলী বিদ্ধ হলো শূকরটার কাঁধে।

সে আহত হয়ে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠলো। ভীষণ শব্দ করে আক্রমণ করলো শূকরটা নূরকে।

নূর দ্বিতীয়বার গুলী ছুড়বার পূর্বে পড়ে গেলো মাটিতে।

শূকরটা আক্রমণ করলো তাকে।

নূর দু'হাতে শূকরটাকে জাপটে ধরে তাকে কাবু করার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। শূকরটার কবল থেকে রক্ষা নেই নূরের।

পেছনে পেছনে কখন যে আলীও এসে পড়েছিলো। সে ছোট সাহেবকে একটি বন্য শূকরের কবলে পড়তে দেখে চিৎকার করে উঠলো—বাঁচাও! ছোট সাহেবকে বাঁচাও! কে কোথায় আছো বাঁচাও...

এমন সময় একটা তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো শূকরটায় পাঁজরে।

শূকরটা এবার ঢলে পড়লো।

আলী কিন্তু চিৎকার করলেও সে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেনি, কারণ ছোট সাহেব তাকে গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে বলেছে। যদি সে তাকে অবাধ্য হতে দেখেন তাহলে চাকরিটা যাবে।

আলী একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিলো, বেরিয়ে আসার সাহস তার হলো না। আড়াল থেকে সে দেখলো একটা মেয়ে তীর-ধনু হাতে এগিয়ে আসছে।

আলীর দু'চোখে বিস্ময়।

শূকরটা মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নূর উঠে দাঁড়িয়েছিলো। কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছিলো তার। কারণ শূকরটির ধারালো নখ নূরের কপালের একপাশে স্পর্শ করেছিলো। তাই কেটে গিয়েছিলো বেশ খানিকটা।

হঠাৎ ফুল্লরাকে তীর-ধনু হাতে সম্মুখে দন্ডায়মান দেখে অবাক হলো না বরং একরাশ আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো তার ব্যথা কাতর মুখে। ক্ষতের যন্ত্রণা ভুলে গেলো নূর মুহূর্তের জন্য, বললো—ফুল্লরা, তুমি আমার জীবন রক্ষা করলে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ফুল্লরা একবার নূর আরেকবার শূকরটার দিকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলো। নূরের কথায় কোনো জবাব না দিয়েই। নূর বললো—ফুল্লরা শোন।

থমকে দাঁড়ালো ফুল্লরা, চোখেমুখে তার ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে, হয়তো বা একজন অপরিচিত ব্যক্তির মুখে নিজের নামটা শুনে তার ভীষণ রাগ হচ্ছিলো। তবু না দাঁড়িয়ে পারলো না।

নূর বললো—আমার কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে যদি একটু পানি দিতে, আমি কপালের রক্ত ধুয়ে ফেলতাম।

ফুল্লরা বললো—পানি নেবে তা আমি কোথায় পাবো। এখানে তুমিও যেমন শিকারে এসেছো তেমনি আমিও শিকারে এসেছি। যাও জলাশয় খুঁজে নিয়ে...

নূর বলে উঠলো—ফুল্লরা, তোমার বাড়ি কোথায়?

সে কথা তোমার জেনে লাভ কি? যাও ওদিকে একটা জলাশয় আছে।

আমি চিনি না, যদি একটু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও তাহলে বড় উপকৃত হবো।

ফুল্লরা কিছুক্ষণ মৌন থেকে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো—এসো।

ফুল্লরা চললো আগে।

পেছনে চললো নূর।

আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আলী। তার দৃষ্টি রয়েছে ছোট সাহেবের দিকে। ছোট সাহেবের কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে এ দৃশ্য তার সহ্য হচ্ছিলো না তবু তাকে নিশ্চুপ থাকতে হচ্ছে। কারণ ছোট সাহেবের হুকুম গাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা। যদি তিনি জানতে পারেন সে গাড়ি ত্যাগ করে নেমে এসেছে তাহলে চাকরিটা তার চলে যাবে।

তাই বেচারী আলী আড়াল থেকে সব দেখলেও সম্মুখে আসতে সাহসী হচ্ছিলো না। নূর যখন শুকরটির আক্রমণে ভূতলে পড়ে গিয়েছিলো তখন আলী নিশ্চুপ থাকতে পারেনি প্রাণফাটা চিৎকার করেছিলো প্রভুকে রক্ষা করার জন্য। আর সেই চিৎকার শুনেই ছুটে এসেছিলো ফুল্লরা এবং তীর নিক্ষেপ করে নূরকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলো ভয়ঙ্কর শুকরটার কবল থেকে।

ফুল্লরা আর নূর একটি জলাশয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো সে জলাশয়টা, তারপর বললো—যাও ওখানে তোমার কপালের রক্ত ধুয়ে নাও...কথাটা বলেই ফুল্লরা চলে যাচ্ছিলো।

নূর ডাকলো—এই শোনো।

ফুল্লরা থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো নূরের দিকে, কি বলতে চায় নূর।

ফুল্লরাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে নূর বললো—এসো। ফুল্লরা এসো।

ফুল্লরা এগিয়ে এলো।

নূর বললো—ফুল্লরা, আমার কপালের ক্ষতটা বড় ব্যথা করছে।

পানিতে ধুয়ে নাও।

নূর জলাশয়ের দিকে পা বাড়ালো।

এবার ফুল্লরা বললো—দাঁড়াও, আমি আঁচল ভিজিয়ে তোমার রক্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তুমি বরং এখানে বসো।

নূর এতক্ষণে স্বস্তি পেলো তার কথায়।

বসলো নূর জলাশয়ের তীরে।

ফুল্লরা আঁচল ভিজিয়ে নিয়ে এলো, তারপর আঁচলের পানি দিয়ে নূরের কপালের ক্ষতটা পরিষ্কার করে দিলো।

ফুল্লরার কোমল হাতের স্পর্শ নূরকে অপূর্ব এক আবেশে অভিভূত করে ফেললো।

নূর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছে ফুল্লরাকে। তার জীবনে ফুল্লরা প্রথম এক স্বপ্নময় নারী হয়ে এলো।

নূরের কপালে আঁচল ছিড়ে পট্টি বেঁধে দিয়ে বললো—চলে যাও শিকারী, আর এ বনে এসো না।

ফুল্লরার কথাটা বড় বেদনাদায়ক মনে হলো, কারণ নূর চায় আবার আসতে এবং ফুল্লরার সান্নিধ্য লাভ করতে কিন্তু ফুল্লরার কথায় ছিলো না কোনো ভালোবাসার ছোঁয়াচ, ছিলো শুধু করুণার স্বর।

ফুল্লরা চলে যায়।

নূর ফিরে আসে তার গাড়িতে।

আলী কিন্তু গাড়িতে আগেই এসে বসেছিলো, যখন ফুল্লরাকে বিদায় জানালো তখন আলী আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এসে বসলো গাড়ির মধ্যে।

নূর কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ফিরে এলো গাড়িতে।

আলী বললো—ছোট সাহেব, আগেই বলেছিলাম জঙ্গলে বিপদ ওৎ পেতে থাকে, আপনি তবু এলেন। এখন ঐ কপাল নিয়ে কি করে ফিরে যাবেন?

আলী, বেশি কথা বলবি না। যা ভাগ্যে ছিলো তাই হয়েছে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে গেছে, বুঝলি?

ছোট সাহেব ডাহা মিথ্যা বলছেন, বেশ বুঝতে পারে আলী। সব সে নিজের চোখে দেখেছে। শূকরটাকে যদি ঐ মেয়েটা না হত্যা করতো তাহলে আর ফিরে যেতে হতো না ছোট সাহেবকে। ভাগ্যিস চিৎকার করেছিলো আলী।

তবে আলীর চিৎকার মনে নেই বা স্মরণে আসে না নূরের। যে মুহূর্তে আলী প্রাণফাটা চিৎকার করেছিলো সেই মুহূর্তে নূরের স্বাভাবিক সংজ্ঞা ছিলো না সে তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলো, সেই কারণেই আলীর চিৎকার তার কানে প্রবেশ করতে পারেনি।

ড্রাইভিং আসনে উঠে বসে নূর—কপালে চোট লেগেছে—খবরদার বলবিনে আম্মি আর দাদীমার কাছে, বুঝলি?

কিন্তু আম্মাজান আর দাদীআম্মা যদি সংবাদ শুনে এসে পড়েন তখন...

তখন যা বলতে হয় আমি বলবো, খবরদার তুই কোনো কথা বলবি না।

আচ্ছা ছোট সাহেব।

আচ্ছা নয়, সত্যিই চুপ থাকবি।

আচ্ছা।

নূর গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

রাইফেলটা সে হাতে করেই এনেছিলো, সেটাকে সে রাখলো পেছন আসনের উপরে।

❑

ফুল্লরা আস্তানায় প্রবেশ করে ছুটে গেলো তার মায়ের পাশে। চঞ্চল কণ্ঠে বললো—মা, জানো আজ আবার সেই বাবু এসেছিলো আমাদের বনে শিকার করতে।

কোন্ বাবু? বললো নাসরিন।

দু'চোখ বড় করে বললো ফুল্লরা—ঐ যে সেদিন যে বাবু হরিণ মারতে এসেছিলো। আমি আর সে একই হরিণকে শিকার করেছিলাম...

ও, এবার বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সে বাবু কান্দাই জঙ্গলে রোজ শিকার করতে আসে কেন রে?

তা আমি কেমন করে বলবো? তবে এবার বাবু নিজেই শিকার বনে গেছে জানো মা, বাবুটাকে একটা বন্য শূকরে আক্রমণ করেছিলো। ভাগ্যিস্ আমি তীর ছুঁড়ে শূকরটাকে মারতে পেরেছিলাম, তাই বাবু জীবনে বেঁচে গেছে।

খুব ভাল করেছিস মা ফুল্লরা। একটা জীবন রক্ষা করে তুই খোদার রহমত লাভ করেছিস।

সত্যি মা?

হাঁ সত্যি।

তবে আমি খুব ভাল কাজ করেছি...কথাটা আপন মনে বলতে বলতে চলে যায় ফুল্লরা।

পথে পড়ে যায় বনহুর।

ফুল্লরা সংকুচিত হয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

বনহুর ওকে আদর করে ফুল বলে ডাকতো, ফুল্লরা নামটা তারই দেওয়া। ফুল্লরার চেহারাটা সত্যি ফুলের মত সুন্দর কিনা তাই।

বনহুর হেসে বললো—ফুল, তোমাকে বড় খুশি খুশি লাগছে?

বললো ফুল্লরা—সর্দার, আমি একটা লোকের জীবন বাঁচিয়েছি। তাই মা বললো তোর উপর খোদার রহমত হবে।

হাঁ ফুল্লরা, তাই হয়। আচ্ছা লোকটার কি হয়েছিলো?

ফুল্লরা সব কথা খুলে বললো।

বনহুর একটু ভাবলো, কে সে বাবু যে কান্দাই জঙ্গলে এসেছিলো শিকার করতে একদিন নয় দু'দিন।

বললো ফুল্লরা—সর্দার, বাবুর চেহারাটা ঠিক তোমার মত কতকটা।

আমার মত?

হাঁ, তোমার মত তার নাক চোখ মুখ—

ও!

কি বুঝলে সর্দার?

আমি তাকে দেখেছিলাম তাই—চলে যায় বনহুর সেখান থেকে। ফুল্লরা যদি তাকে আরও কোনো প্রশ্ন করে বসে তাহলে জবাব দিতে পারবে না সে। ফুল্লরার কথায় সে বুঝতে পেরেছে সেই বাবু অন্য কেউ নয়, তারই ছেলে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নূরুজ্জামান চৌধুরী নূর। ভাগ্যিস ফুল্লরা সেদিন বন্দীকে দেখেনি তাই রক্ষা, নাহলে নূরকে আবার সে বন্দী করে নিয়ে আসতো আস্তানায়। তবে জাভেদের নজরে যদি পড়ে যায় তাহলে মুস্কিল হবে—একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে বনহুরের মুখমন্ডলে।

বনহুর তার ড্রেসিং গুহায় প্রবেশ করে জমকালো পোশাক পরে নিলো। পিস্তল ভরে নিলো প্যান্টের পকেটে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ালো বনহুরের সম্মুখে। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো—চমৎকার অপূর্ব—

তার মানে?

ভারী সুন্দর লাগছে তোমাকে।

এ কথা কতবার শুনেছি তোমার মুখে।

শুধু আমার মুখেই নয়, বহু নারীর মুখে তুমি এ কথা শুনেছো।

অস্বীকার করছি না, বলো তারপর?

তারপর কোথায় চললে শুনি?

কান্দাই শহরে।

কেন? আবার কি দস্যুতার জন্য ডাক এসেছে?

না।

তবে?

চৌধুরীবাড়িতে যাবো।

এ ড্রেসে না গেলেই কি নয়?

তাহলে কোন্ ড্রেসে যাবো বলো?

স্বাভাবিক নাগরিক বেশে যাও সন্তানের কাছে।

নূরী!

হাঁ হুর, নূর কিন্তু তার পিতার জন্য অস্থির রয়েছে। কতদিন তার মা সন্তানকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে রাখতে পারে বলো? আমি জানি মনিরা আপা তার সন্তানকে জানিয়ে দিয়েছে তুমি আফ্রিকার কোনো এক জায়গায় থাকো। সেখানে তোমার দায়িত্বপূর্ণ চাকরি, যার জন্য দেশে আসতে পারো না।

এসব তুমি কেমন করে জানলে নূরী?

তোমার অবর্তমানে আমি তার বাসায় গিয়েছিলাম।

বলো কি নূরী!

হাঁ।

কেমনভাবে গেলে?

শুনবে?

শুনতে ইচ্ছা করছে, কারণ তুমি যখন এত কথা জেনে নিয়েছো, আমারও জানা দরকার।

তবে শোনো, আমি একদিন চুড়িওয়ালীর বেশে শহরে যাই এবং একেবারে চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে হাজির হই।

তারপর?

দরজায় বাধা পাই, পাহারাদার কিছুতেই ভিতরে আমাকে প্রবেশ করতে দিচ্ছিলো। আমি পাহারাদারকে হাত করে নিয়ে ভিতরে যাই। প্রথমেই আসেন তোমার মা, তিনি আমাকে বললেন, চুড়ি আমরা পরি না মা, তুমি যেতে পারো। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা, চুড়ি তাঁকে নিতেই হবে। নতুন ধরনের চুড়ি এনেছি...শুনে বললেন তিনি,—দেখি বৌমাকে পাঠিয়ে দেই।

তারপর?

তোমার মা উপরে চলে গেলেন, একটু পরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন তোমার আদরিণী মনিরা আপা।

এবার নিশ্চয়ই সে তোমাকে চিনে ফেললো?

মোটেই না।

তাহলে....

আমাকে দেখে বললো সে—কেমন চুড়ি আছে দেখাও দেখি।

আমি মনিরা আপার হাতখানা টেনে নিয়ে দেখলাম, তারপর নতুন ধরনের চুড়ি বের করে পরিয়ে দিলাম। ভারী সুন্দর মানিয়ে ছিলো ওকে! বললেন—তোমার চুড়িগুলো সত্যি প্রশংসনীয়। আমি বললাম—আপনার স্বামী খুব খুশি হবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো মনিরা আপা—সে বহু দূরে আছে।

তারপর আমি তাঁকে ধরে বসলাম। তখন সে আমাকে যে কথা জানালো তাতে বেশ বুঝতে পারলাম। মনিরা তার সন্তান নূরকেও জানিয়েছে তার আব্বু আফ্রিকার কোনো এক স্থানে কাজ করেন...বাস্ সব জানা হয়ে গেলো।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হুঁ!

নূরী বললো—হুঁ করলেই চলবে না, তোমাকে স্বাভাবিক বেশি চৌধুরীবাড়িতে যেতে হবে।

বনহুর মেনে নিলো নূরীর কথাগুলো।

❑

আহত অবস্থায় ফিরে এলো নূর।

শিকারে গিয়ে বন্য শূকরের পাল্লায় পড়ে জখম হয়েছে কথাটা প্রকাশ পেতে বিলম্ব হলো না।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা এসে হাজির হলেন।

তাঁরা তো নূরকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার এলো।

চিকিৎসা চললো পুরোপুরি।

নূর কিন্তু মোটেই কাবু হয়নি।

সে বিপুল সাহস নিয়ে বললো—আমার তেমন কিছু হয়নি, দু'দিনেই সেরে যাবে।

মিঃ শংকর রাও নিজে এসেছিলেন নূরুজ্জামান চৌধুরীকে দেখতে, এসে সহানুভূতি জানালেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করলেন।

গাড়ি নিচে অপেক্ষা করছিলো।

মিঃ শংকর রাও গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

কিছুটা পথ চলার পর মিঃ শংকর রাও চমকে উঠলেন, কারণ তাঁকে অন্যপথে আনা হয়েছে। অন্যমনস্ক থাকার জন্য তিনি বুঝতে পারেননি।

মিঃ শংকর রাও বললেন—ড্রাইভার, এ কোন্ পথে নিয়ে এলে?

মুখ ফিরিয়ে তাকালো ড্রাইভার, বললো ঠিক পথেই আনা হয়েছে।

মিঃ শংকর রাও বিস্ময়ে শব্দ করে উঠলেন—দস্যু বনহুর।

হাঁ বন্ধু, আমি।

কিন্তু...

আপনাকে ক'দিন আমার আস্তানার নির্জন কক্ষে বিশ্রাম করতে হবে।

মিঃ শংকর রাও ভাবতেও পারেননি তাঁর গাড়ির ড্রাইভ আসনে স্বয়ং দস্যু বনহুর। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন এ পথে লোকজন বা যানবাহন

নেই। গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়তেই ড্রাইভিং আসন থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর, তার ডান হাতে রিভলভার।

মিঃ শংকর রাওয়ের পকেটেও রিভলভার ছিলো কিন্তু তা বের করার সুযোগ পেলেন না। অসহায় বালকের মত নেমে পড়তে বাধ্য হলেন।

বনহুর মিঃ শংকর রাওকে বললো—বিনা বাক্যে আমার সঙ্গে এগিয়ে চলুন।

তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

আমার আস্তানায়।

কেন?

ক'দিন বিশ্রাম করবেন।

বনহুর!

আমিই যে বনহুর তা আপনার চিনতে কষ্ট হয়নি দেখছি। একটু থেমে বললো বনহুর—কান্দাই শহরে পুলিশমহলে এখন একটিমাত্র ব্যক্তিই আছেন যিনি আমাকে চেনেন—তিনি হলেন আপনি।

তাই তুমি আমাকে আটক করে লুটতরাজ হত্যালীলা চালাতে চাও?

না।

তবে।

আমি আমার সন্তান নূরের পাশে পিতার বেশে হাজির হতে চাই। জানি এ কথা আপনি জানলেও আমার সন্তান নূরকে কোনোদিন বলতে পারবেন না, কারণ সন্তানকে দিয়েই আপনি স্বার্থসিদ্ধ করতে চান। আমাকে বন্দী করতে চান নূরের সাহায্যে...

এত কথা তুমি জানলে কি করে?

পুলিশমহলের এমন কোনো কথা নেই যা আমি জানি না। চলুন এবার তবে চোখ দুটো আমি বেঁধে দেবো, কোনো আপত্তি চলবে না।

মিঃ শংকর রাও কোনো আপত্তি করতে পারলেন না, কারণ দস্যু বনহুরের কাজে বাধা দেবার মত শক্তি ছিলো না তাঁর।

❑

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির নূরের নামে। তার পিতা মনিরুজ্জামান চৌধুরী দেশে আসছেন।

আনন্দে আত্মহারা হলো নূর।

ভুলে গেলো সে নিজের অসুস্থ অবস্থা।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় গাড়ি নিয়ে ছুটলো সে চৌধুরীবাড়িতে।

টেলিগ্রাম দেখালো নূর মা আর দাদীমাকে।

মনিরার মুখে কোনো কথা বের হলো না।

মরিয়ম বেগম আনন্দভরা কণ্ঠে বললেন—এতদিন পর মা, সন্তান এদের কথা মনে পড়েছে তাহলে।

দাদী আম্মু, তুমি যাবে না আব্বুকে বিমান বন্দর থেকে এগিয়ে আনতে?

নূরের কথায় বললেন মরিয়ম বেগম—তুমি আর সরকার সাহেব যেও তাহলেই চলবে।

আম্মি, তুমিও কি যাবে না?

না।

কেন?

যার কোনোদিন স্ত্রী-পুত্র-মার কথা মনে পড়ে না তার আগমনে আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই।

আম্মি, এ কথা আব্বু, শুনলে ব্যথা পাবে।

আর আমাদের বুকে কত ব্যথা জমা হয়ে আছে তার খোঁজ কোনোদিন সে নিয়েছে? যাক তুমি আর সরকার সাহেব গেলেই চলবে!

নূর আর সরকার সাহেব বিমান বন্দরে গেলেন এবং বিমান বন্দর থেকে চৌধুরী মনিরুজ্জামানকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এলেন বাড়িতে।

সরকার সাহেব আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করে বললেন—এতদিন পর এলে মনির?

হেসে বললো বনহুর—আপনি তো জানেন সরকার চাচা, ইচ্ছে করলেই আসা যায় না।

নূর তো আনন্দে আত্মহারা কতদিন পর সে পিতাকে ফিরে পেয়েছে। প্রাণভরে সে পিতাকে দেখছে! অপূর্ব পৌরুষদীপ্ত একটি মুখ, যে মুখের সঙ্গে তুলনা হয় না আর কোনো মানুষের!

নূর আজ ছোট্টটি নয়, সে অনেক বড়। একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ। শিশুর মত পিতার কোলে গিয়ে বসতে না পারলেও একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

বনহুর নূরকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো।

কারণ এমন করে দেখবার সুযোগ তার হয়নি অনেকদিন।

এক সময় বললো নূর—আব্বু, আমাদের স্নেহ মায়া মমতার চেয়ে তোমার কাছে টাকাটাই বড়?

হঠাৎ নূরের এ প্রশ্নে বনহুর একটু বিব্রত হলো, তবু সে চট করে নিজকে সামলে নিয়ে বললো—নূর, তুমি কি মনে করো আমি শুধু টাকার জন্য তোমাদের থেকে দূরে রয়েছি?

হাঁ, আমার তাই মনে হয়।

নূর।

বলো আব্বু?

টাকা বা ঐ ধরনের কোনো বস্তুর জন্য আমি দূরে থাকি না। যেখানে থাকি সেখানে আমার সাধনার সামগ্রী রয়েছে। নূর আমি...থাক সে সব কথা। এবার বলো তোমার খবর?

বললো নূর—আব্বু, আমার খবর বলবো, কারণ জানি তুমিই পারবে আমাকে বুদ্ধি বাতলে দিতে। তার পূর্বে বলো এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

কোথায়? চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুর পুত্রের মুখের দিকে।

বললো নূর—তুমি যেখানে থাকো। সেই আফ্রিকার কোনো অজানা স্থানে?

বেশ, যেতে চাও নিয়ে যাবো। এখন তো ছোট্টটি নও, বড় হয়েছো, কোনো অসুবিধা হবে না।

নূর ছোট বালকের মত আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো—সত্যি আব্বু তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তো?

হাঁ।

ছুটলো নূর আম্মির ঘরে।

ঘরে গিয়ে দেখলো আম্মি নেই। এলো বারান্দায়। সেখানেও নেই মনিরা। এবার নূর ডাকাডাকি শুরু করে দিলো—আম্মি, আম্মি তুমি কোথায়?

হঠাৎ নূরের দৃষ্টি চলে গেলো দোতলার বেলকুনিতে। ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মনিরা।

নূর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে হাজির হলো মায়ের পেছনে, আলগোছে টিপে ধরলো মায়ের চোখ দুটো।

মনিরা পুত্রের হাতের উপর হাত রেখে বললো—এখানে কি করতে এলি নূর?

আব্বু কতদিন পর এসেছেন আর তুমি এখানে...জানো আম্মি, আব্বু কথা দিয়েছেন এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

কোথায়?

যে দেশে তিনি থাকেন সেই আফ্রিকার জঙ্গলে—

জঙ্গলে?

ধরো তাই।

নূর আমি তোকে যেতে দেবো না।

হো হো করে হেসে উঠলো নূর—তুমি কচি খুকীর মত কথা বললে আম্মি। আমি এখন অনেক বড়; একাই চলে আসতে পারবো।

কি হচ্ছে, মা ছেলে মিলে কিসের গল্প হচ্ছে শুনি? বনহুর আপনা আপনি মনিরার আর নূরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বললো—তুমি সবার মায়া বিসর্জন দিয়েছো, আবার নূরকে কেন টানছো বলো তো?

নূর বলে উঠলো—আব্বু মোটেই টানছেন না, আমিই তাঁকে ধরে বসেছি এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

বনহুর আর মনিরার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

নূর হেসে বললো—কারও বাধাই আমি শুনবো না। এবার আমি যাবোই, দেখতে চাই আব্বু ওখানে তোমার কি কাজ।

নূরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর স্থির অটল।

❑

একদিন দু'দিন তিন দিন কেটে গেলো।

বললো বনহুর আমার যাবার দিন এগিয়ে আসছে।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললো—আর কতদিন তুমি সন্তানের কাছে ফাঁকি দিয়ে বেড়াবে? এবার নূর তোমার সঙ্গে যাবে বলেছে, ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

আফ্রিকায়।

কিন্তু—

সব ঠিক হয়ে গেছে।

তার মানে?

কায়েস কাল বন্ধুর বেশে এসেছিলো, আমি তার কাছে সব লিখে জানিয়ে দিয়েছি।

তুমি সেখানে মস্ত বড় কিছু করো, এ কথাই জানে নূর।

সে ব্যবস্থা আমি করেছি মনিরা।

কিন্তু সে ডিটেকটিভ এবং তোমারই ছেলে, বুঝতেই পারছো তার কাছে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

তুমি কিছু ভেবো না মনিরা, সব ঠিক হয়ে যাবে। শোনো নূরের কপালের ক্ষতটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে, কারণ আজও পর্যন্ত তার ক্ষতটা শুকায়নি। আমি কাল ডাক্তারের পাশে বসে সব দেখেছি।

হাঁ আমি নিজেও এ ব্যাপারে বেশ চিন্তিত আছি। আচ্ছা একটা কথার সঠিক জবাব দেবে?

নিশ্চয়ই দেবো। আর কবেই বা তুমি আমার কাছে সঠিক জবাব পাওনি?

আচ্ছা তুমি নূরকে কেন তোমার আস্তানায় আটক করেছিলে জবাব দাও?

আমি তাকে আটক করিনি!

মিথ্যে কথা।

তুমি বিশ্বাস করো আমি নূরকে আটক করিনি।

তবে কে তাকে আটক করেছিলো।

জাভেদ!

জাভেদ, সেই শয়তানী মেয়েটার ছেলে?

মনিরা!

জানি তুমি...

মনিরা তুমি সব জানো, জেনেও এ ধরনের উক্তি তোমার করা উচিত নয়।

ঐ শয়তানী আমার স্বামীকে হরণ করেছে...আমার জীবনকে অশান্তিময় করে দিয়েছে।

মনিরা যদি সে বলে তুমি তার স্বামীকে...

না, তুমি আমার স্বামী! চিরদিন আমার থাকবে। তুমি কোনোদিন অপরের হতে পারো না। আমি তা সহ্য করতে পারবো না। শোনো এর পর যদি নূরকে জাভেদ কোনো রকম আঘাত করে তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করবো না। পুলিশকে সব কথা জানিয়ে দেবো।

মনিরা, তুমি কেন আজও নূরীকে মেনে নিতে পারছো না। কেন তুমি তার নাম শুনলে রেগে উঠো। জানো মনিরা নূরী তোমায় কত ভালবাসে।

আমি তার ভালবাসার জন্য লালায়িত নই।

তবু সে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তোমার সন্তান নূরকে জীবনের চেয়েও এমন কি তার নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি স্নেহ করে। মনিরা, তোমার নূরকে জাভেদ বন্দী করে নিয়ে গেলেও এতটুকু অযত্ন তার হয়নি...

সব আমি নূরের মুখে শুনেছি। একটু থেমে বললো মনিরা—তোমার সেই নূরী আমার নূরকে যাদু করেছে। সে তার কথা ভুলতে পারেনি। সব সময় আমাকে তার কথা বলে।

মনিরা, এটা তার মহত্ব...

না, আমি মানি না।

মনিরা, মনকে বড় করো।

তুমি কি মনে করো আমার মন...

বনহুর মনিরার মুখে হাতচাপা দেয়—না, আমি জানি তুমি সীমাহীন ধৈর্যশীলা নারী। মনিরা, তোমার প্রেরণা, ভালবাসা না পেলে আমি নিঃস্ব হয়ে যেতাম। গভীর আবেগে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় বুকে।

❑

আফ্রিকা তোমার কাছে কেমন লাগছে নূর! বললো বনহুর।

নূর খেতে খেতে জবাব দিলো—বড় সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর তোমার বাড়িখানা। সত্যি আব্বু, এর পূর্বে এমন সুন্দর বাড়ি আমার নজরে পড়েনি। পাহাড়ের উপরে বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি অপূর্ব। বারান্দায় দাঁড়ালে দৃষ্টি চলে যায় দূরে অনেক দূরে। লন্ডনেও আমি এত সুন্দর বাড়ি দেখিনি। আব্বু, তুমি এতদিন কেন গোপন করেছো পৃথিবীর অদ্ভুত অদ্ভুত বৃক্ষ নিয়ে তুমি গবেষণা করছো? কেন সবাইকে বলেছো তুমি এক দায়িত্বপূর্ণ বড় চাকরি করো?

এ আর এমন কি! অহেতুক খেয়াল ছাড়া কিছু নয়। তা ছাড়া তোমার মা এ সব শুনলে ভীষণ রাগ করবেন, তাই...

তাই তুমি বছরের পর বছর আত্মগোপন করে আফ্রিকার জঙ্গলে গাছপালা নিয়ে গবেষণা চালাবে, এতে তোমার লাভ কি আব্বু?

পরে একদিন সব জানবে নূর।

এখনও কি তুমি মনে করো আমি ছোটই আছি, আব্বু, তোমার সাধনা এবার দেশে চালাতে হবে।

তা কি হয়, এত গাছপালা দেশে পাবো কোথায়?

কেন, দেশে কি গাছপালার অভাব?

আফ্রিকার জঙ্গলে আমি হাজার হাজার বছর আগের গাছের সন্ধান পেয়েছি, আর আমাদের দেশে—

বুঝেছি তোমার সাধনা দেশে চলবে না। তোমার সাধনা আফ্রিকার জঙ্গল।

হাসলো বনহুর।

আব্বু।

বলো?

আম্মিকে চিরদিন এভাবে দূরে রেখে তুমি শান্তি পাও?

সাধনা বড় কঠিন জিনিস নূর। যাক ওসব কথা, বলো আজ কোন্ দিকে যাবে?

এই এক সপ্তাহ বহু জায়গা, বহু জঙ্গল, বহু জীবজন্তু দেখলাম, এবার ফিরে যাবো ভাবছি।

আর ক'টা দিন থেকে যাওনা নূর।

আব্বু, তোমাকে ছেড়ে তোমার এই সুন্দর বাংলো ছেড়ে মোটেই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, তবু যেতে হবে।

কেন, এত তাড়া কিসের?

তোমার যেমন সাধনা বৃক্ষ নিয়ে, তেমনি আমার সাধনা দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা...

মৃদু হাসলো বনহুর।

নূর বললো—আব্বু, আমি কালকেই রওনা দেবো।

আমাকে যেতে হবে তোমার সঙ্গে?

না আব্বু, আমি একাই যেতে পারবো।

জানি পারবে। লন্ডন থেকে তুমি একাই তো এসেছো। কাজেই কোনো অসুবিধা হবে না। পৌঁছে সংবাদ পাঠাবে। মায়ের দিকে সব সময় নজর দিও।

আচ্ছা আব্বু।

নূরকে বিমান বন্দরে বিমানে তুলে দিয়ে ফিরে এলো বনহুর তাঁর বাংলোয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে, তারপর চাবি দিয়ে একটা দরজা খুলে ফেললো। ঐ কক্ষে লিফট ছিলো। বনহুর লিফটে চেপে নেমে গেলো নীচে।

একটা সুন্দর কক্ষ।

বনহুর কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করতেই এক বৃদ্ধ তার সম্মুখে এগিয়ে এলেন। মাথায় শুভ্র একরাশ চুল, মুখে একমুখী লম্বা দাড়ি, ভ্রু জোড়াও সাদা ধব্‌ধবে চোখ দুটো আজও ঘোলাটে হয়ে যায়নি। তেজোদ্দীপ্ত দৃষ্টিমুখে হাসির আভাষ।

বনহুর হাত বাড়িয়ে দিলো।

বৃদ্ধ করমর্দন করলেন।

বনহুর বললো—অশেষ ধন্যবাদ মিঃ হ্যারিসন লর্ড। আপনার গবেষণাগার এবং বাংলো আমাকে এক সপ্তাহের জন্য ছেড়ে দিয়ে আপনি আমাকে কৃতার্থ করেছেন। চিরদিন স্মরণ থাকবে আপনার কথা।

মিঃ লর্ডের মুখে দীপ্তিময় হাসি।

বনহুর বললো—এবার কান্দাই ফিরে যেতে হবে, সেখানে আমার শহরের আস্তানায় আটক আছেন মিঃ শংকর রাও। এবার তাঁকে মুক্তি দিতে হবে।

বেরিয়ে যায় বনহুর সেই কক্ষ থেকে।

আবার সেই বিমান বন্দর।

গাড়ি থেকে নামলো বনহুর বিমান বন্দরে। এখন তাকে দেখলে চিনবার যো নেই, কারণ বনহুর এখন এক কাবুলিওয়ালা।

মুখে দাড়ি।

চোখে কালো চশমা।

ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরা, হাতে দামী ঘড়ি।

বনহুর বিমান বন্দরে নেমে দাঁড়াতেই তার মনে পড়লো কয়েক ঘন্টা পূর্বে নূরকে সে বিমানে তুলে দিয়ে গেছে। তাকেও যেতে হচ্ছে একই স্থানে কিন্তু পৃথক বিমানে।

বিমান দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর অন্যান্যের সঙ্গে বিমানের দিকে পা বাড়ায়। একবার তাকায় সে বহুদূরে পাহাড়ের দিকে, যেখানে মিঃ লর্ড সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে এসেছেন।

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো।

তাড়াতাড়ি বিমানে চেপে বসলো এবার সে। অন্যান্য যাত্রী নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন।

বিমান এখন আকাশে উড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ঠিক ঐ মুহূর্তে বিমানের দরজা খুলে প্রবেশ করলেন আফ্রিকার পুলিশ প্রধান, বললেন, বিমান উড়বে না—বিমানটিকে পুলিশবাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছে। এই বিমানে দস্যু বনহুর আছে জানা গেছে—

সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

পরবর্তী বই

মহাচক্র

মহাচক্র—১০২

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

পুলিশ প্রধানের হাতে রয়েছে গুলীভরা রিভলভার। তিনি তাকাচ্ছেন প্রতিটি যাত্রীর মুখের দিকে। কারণ এই যাত্রীদের মধ্যেই রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর।

কে এই দস্যু বনহুর কে জানে।

সবার মনে একই প্রশ্ন।

প্রত্যেক যাত্রীই তার পাশের আসনে উপবিষ্ট যাত্রীর মুখের দিকে সন্দিহান দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন, কারণ সেই যে দস্যু বনহুর নয়, তা কে জানে! যাত্রীরা বিমান থেকে নেমে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

পুলিশ প্রধান বললেন—আপনারা বিচলিত হবেন না। আমরা জানতে পেরেছি দস্যু বনহুর এই বিমানে যাত্রী হিসেবে আছে। আমরা তাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবো।

পুলিশ প্রধানের সান্ত্বনাবাণী যাত্রীদের মনে মোটেই সাহস সঞ্চয় করতে পারলো না। তারা বিমান থেকে নেমে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

পুলিশ প্রধান পুনরায় যাত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন—আপনারা সবাই একে একে নেমে পড়ুন। নিচে আমাদের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আছে। আশা করি দস্যু বনহুরকে আমরা সহজেই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবো। আপনাদের ভীতির কোনো কারণ নেই।

যাত্রীরা এবার বিমান থেকে অবতরণ আশায় এক একজন করে বিমানের সিঁড়িপথের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

পুলিশ প্রধান চলে এলেন সিড়িমুখে কারণ যাত্রীগণ সবাই নেমে পড়বে, এমতাবস্থায় সিঁড়ির দিকে নজর রাখা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করলেন তিনি।

যাত্রীরা প্রায় দেড়শতের বেশি হবে, সবাই বিমান থেকে নেমে আসছে এক এক করে।

পুলিশ প্রধান পকেট থেকে বনহুরের ফটো বের করে সবার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন।

না, কারও সঙ্গে মিল খাচ্ছে না ফটোখানা।

পুলিশপ্রধান হাঁপিয়ে পড়লেন!

তবে কি সব মিথ্যা?

এ বিমানে দস্যু বনহুর নেই?

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন দস্যু বনহুরের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না তখন পুনরায় যাত্রিগণকে বিমানে উঠে বসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

এবার যাত্রীরা বিমানে আরোহণ করবার সময় একটু বিব্রত বোধ করলো, কারণ তাদের মন থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি দস্যু বনহুরের নামটা।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে যাত্রীরা বিমানে উঠে বসলো বটে কিন্তু তারা আশঙ্কিত মন নিয়ে তাকাতে লাগলোএ-ওর মুখের দিকে।

পুনরায় সমস্ত যাত্রীকে চেক্ করে দেখা হলো।

পুলিশপ্রধান এবার আশ্বস্ত হয়ে নেমে পড়লেন বিমান থেকে।

বিমান এবার রানওয়ে চক্কর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

আফ্রিকা যাত্রীবাহী বিমানখানা এবার রানওয়ের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সোজা চলে গেলো দক্ষিণ দিকে, তারপর উড়ে উঠলো আকাশে।

আফ্রিকা পুলিশবাহিনীসহ পুলিশপ্রধান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিমান বন্দরে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে তিনি নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আশা ব্যর্থ হলো।

তিনি ধারণ করলেন নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর বিমান বন্দরে আশেপাশে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। পুলিশপ্রধান দলবল নিয়ে সমস্ত বিমান বন্দরে তল্লাশি চালিয়ে চললেন কিন্তু কোথাও বনহুরের সন্ধান পাওয়া গেলো না।

আফ্রিকা বিমান বন্দরে যখন আফ্রিকা পুলিশপ্রধান বনহুরের তল্লাশি চালিয়ে চলছেন তখন আফ্রিকা জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে যাত্রীবাহী বিমানখানা।

এখনও যাত্রীদের মুখমন্ডল প্রসন্ন হয়নি।

তাদের মন থেকে মুছে যায়নি দস্যু বনহুরের নামটা, তারা আতঙ্কগ্রস্তভাবে চারদিকে লক্ষ্য করছিলো। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর তাদের প্লেনেই আছে, এই তাদের ধারণা!

যাত্রীদের ধারণা মিথ্যা নয়।

প্লেনখানা যখন আফ্রিকা জঙ্গল অতিক্রম করে সাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো তখন হঠাৎ সাউন্ডবক্সে একটা ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেলো— আপনারা বিচলিত হবেন না, প্লেনখানা দক্ষিণ আফ্রিকার গভীর জঙ্গল অতিক্রম করে এখন সাগরপাড়ি দিচ্ছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমাদের প্লেনখানা মংস্কো দ্বীপে অবতরণ করবে।

সংকেতসূচক প্রতিধ্বনি যাত্রীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। কারণ পথে কোনো দ্বীপে বিমানখানা অবতরণ করার কথা ছিলো না। হঠাৎ এই ঘোষণা হওয়ায় যাত্রীদের মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। তারা অনেকেই বলাবলি করতে লাগলো, এমন অবস্থার কারণ কি?

কিন্তু তার জবাব কেউ দিতে পারলো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানখানা সাগরের বক্ষ লক্ষ্য করে নিচের দিকে অবতরণ করতে লাগলো।

অদূরে সাগরবক্ষে পরিলক্ষিত হচ্ছে একটা দ্বীপ।

মংস্কো দ্বীপ।

আফ্রিকার পুলিশপ্রধান তখন আফ্রিকা বিমান বন্দরের আশেপাশে জোর তদন্ত চালিয়ে চলেছেন।

বিমানখানা অবতরণ সাগরবক্ষের উপরে নীল আকাশে চক্কর দিচ্ছে। যাত্রী এবং বিমানবালা যারা ছিলো তারা বিস্ময় নিয়ে তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

মংস্কো দ্বীপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শুধু শেওলা জাতীয় আগাছা আর বালুকারাশি।

বিমান অবতরণ করবার পূর্বমুহূর্তে বিমানের দ্বিতীয় চালক ঘোষণা করলো—দস্যু বনহুর বিমান চালনা করছে। একটু পূর্বে যে গলার স্বর আমরা সাউন্ড বক্সে শুনতে পেয়েছি তা স্বয়ং দস্যু বনহুরের, কাজেই আপনারা সাবধান! এ বিমানে চারজন বিমান চালক ছিলো। তারমধ্যে প্রথম

চালকই হলো দস্যু বনহুর। যাত্রীদের মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিলো।

যাত্রীদের মধ্যে যাদের নিকটে অস্ত্র ছিলো তারা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলো। মরতে হয় দস্যু বনহুরের সঙ্গে লড়াই করে মরবেন।

এমন কি বিমানবালা ও বিমান চালকগণও অস্ত্র নিয়ে তৈরি হলো।

বিমানখানা চক্রাকারে ঘুরছিলো।

শোনা গেলো পূর্বের সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর—বিমানখানা অবতরণ করবার আর দরকার হবে না...আপনারা মঙ্গলমত ফিরে যান...কথা শেষ হতে না হতেই প্যারাসুট সহ কোনো এক ব্যক্তি বিমান থেকে লাফিয়ে পড়লো শূন্য আকাশে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র।

কিন্তু প্যারাসুটধারী ব্যক্তি প্লেন থেকে অনেক নিচে নেমে গেলো। বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত গুলী গিয়ে আর স্পর্শ করতে পারলো না প্যারাসুটধারীর দেহ।

বিমান চালকগণ সতর্ক হলো, কারণ বিমানখানা এখন দিক বিহীনভাবে আপন ইচ্ছায় উড়ে চলেছে। তারা দ্রুত বিমানের গতি আয়ত্ব করে নিলো। একটু পূর্বে সাউন্ড বক্সের ঘোষণায় তারা জানতে পেরেছিলো স্বয়ং দস্যু বনহুরই বিমান চালনা করছিলো।

এখন বুঝতে পারলো দস্যু বনহুর এই বিমানেই ছিলো এবং সে পাইলটদের মধ্যেই আত্মগোপন করে ছিলো। সেই কারণে খুঁজে পাননি আফ্রিকা পুলিশপ্রধান এমনভাবে তদন্ত চালিয়েও।

বিমান নিয়ে পাইলটগণ তাদের গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে ফিরে চললো।

যাত্রীগণ হকচকিয়ে গিয়েছিলো। এবার তারা নিশ্চিন্ত হলো, কারণ তারা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো দস্যু বনহুর এ বিমানেই ছিলো এবং এখন সে নেই।

সবাই নিজের চোখে দেখেছে দস্যু বনহুর প্যারাসুট সহ লাফিয়ে পড়েছে শূন্য আকাশে। আর সে ফিরে আসবে না বা আসতে পারবে না এ বিশ্বাস তাদের আছে। কাজেই তারা নিশ্চিন্ত।

বনহুর যতই নিচে নামছে তার কানে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। প্রচন্ড প্রচন্ড ঢেউগুলো উছলে পড়ছে একে অপরের গায়ে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো সাগরের ঠিক মাঝামাঝি মংস্কো দ্বীপ। বনহুর এ দ্বীপের নামই শুনেছিলো কিন্তু চোখে দেখেনি কোনোদিন।

আফ্রিকা জঙ্গলের সর্ববৃহৎ সর্প রাজগুলো নাকি এই মংস্কো দ্বীপে এসে আস্তানা গেড়েছে। তবে কতদূর সত্য তা জানে না বনহুর।

প্যারাসুট নিয়ে বনহুর মংস্কো দ্বীপে অবতরণ করার চেষ্টা চালালো কারণ সাগরবক্ষে পড়লে হাঙ্গর আর বিরাট বিরাট কুমীরের মুখ গহ্বরে যেতে তার বিলম্ব হবে না। তার চেয়ে আফ্রিকা পুলিশ বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করা অনেক শ্রেয় ছিলো।

সাগরের গর্জন ভীষণভাবে কর্ণগোচর হচ্ছে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে মংস্কো দ্বীপটার উপরে।

বনহুর প্যারাসুট সহ নেমে আসছে নিচে।

একেবারে সাগর আর দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়েছে বনহুর।

ভাগ্যে কি আছে কে জানে।

প্যারাসুটসহ বনহুর একেবারে এসে পড়লো দ্বীপটার কিনারে, আর একটু হলেই সাগরের বুকে পড়তো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্যারাসুট সহ বনহুর মংস্কো দ্বীপে অবতরণ করলো। তাকিয়ে বিস্মিত হলো—নতুন এক জগৎ।

চারিদিকে অদ্ভুত ধরনের বৃক্ষালতাগুল্ম। কতকটা শেওলা ধরনের উদ্ভিদ বলা যায়। স্থানে স্থানে জমকালো পাথরের স্তূপ ঠিক ছোটোখাটো পাহাড়ের মত।

বনহুর শরীর থেকে প্যারাসুটের রশি খুলে ফেললো। তারপর পাহাড়টার দিকে এগুলো। নিকটবর্তী হতেই দেখতে পেলো বিরাট এক অজগর কুন্ডলি পাকিয়ে বসে আছে একটা পাথরখন্ডের পাশে।

শেওলা ধরনের উদ্ভিদ জন্মেছে সাপটার দেহে।

কেমন যেন অদ্ভুত ভয়ংকর জীব বলে মনে হচ্ছে।

বনহুরের সাহসী মনটাও কেঁপে উঠলো।

ভাগ্যিস সাপটা তাকে দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে তাড়া করে আসতো নিশ্চয়ই। নিজকে সামলে নিয়ে পিছু হটতে লাগলো সে।

কিছুটা পিছুতেই কোনো এক নরম তুলতুলে বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বনহুর পড়ে গেলো মাটিতে। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াতেই তার নজর পড়লো বিরাট আকার একটা স্থূলকায় পিঁপে বা ড্রাম দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে।

বিস্ময়ভরা চোখে অবাক হয়ে দেখছে বনহুর।

পিঁপেটার গায়ে গোলাকার দুটি চোখ।

নিচে একটা মুখ।

যেন পিঁপের গায়ে ছুরি দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে।

বনহুরের দিকে পিঁপে জীবটা কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে।

ঠিক তেমনিভাবে তাকাচ্ছে বনহুরও।

এমন ধরনের অবস্থায় বনহুর বহুবার পড়েছে কিন্তু এমন অদ্ভুত জীবের পাল্লায় সে পড়েনি।

আশ্চর্য হয়ে ঢোক গিললো বনহুর।

জীবটা হা করলো।

মুখ গহ্বরটা যেন একটা জালা বা ড্রামের ফাটল।

বনহুরের দিকে পিঁপেটা এগিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়ালো বনহুর।

নাহলে বিরাট জীবটার দেহ তার দেহটাকে চাপ দিতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর সরে দাঁড়াতেই সর্পরাজ তাকে লক্ষ্য করে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে উঠলো।

সাপটার নিশ্বাস যেন তার দেহে এসে লাগলো।

কি ভয়ংকর উষ্ণ হাওয়া!

বনহুর তাকিয়ে আছে, ঐ মুহূর্তে সর্পরাজের ঠিক মুখের কাছে এসে পড়লো সেই বিস্ময়কর পিঁপেরাজ।

সর্পরাজ তাকে আক্রমণ করলো।

পিঁপে রাজের দেহটাকে সর্পরাজ জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে।

পিঁপেরাজ গড়াতে শুরু করলো।

চললো উল্টোপাল্টে লড়াই।

বনহুর কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, হঠাৎ তার স্মরণ হলো এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই উচিত হবে না। শেষে লড়াই করতে করতে জীব দুটি তার দেহে এসে গড়িয়ে না পড়ে।

তাড়াহুড়া করে বনহুর সরে দাঁড়ালো।

একটা বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সে। গোলাকার জীবটার দেহ সর্পরাজ ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরেছে এবং দাঁত দিয়ে গোলাকার জীবটার দেহে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

সর্পরাজের দংশনে গোলাকার জীবটার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে লাল টক্‌টকে তাজা রক্ত জীবটার দেহে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

সর্পরাজের দংশনে গোলাকার জীবটার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে লাল টক্‌টকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভীষণ সে দৃশ্য।

বনহুর বেশিক্ষণ এ দৃশ্য উপভোগ করবার সুযোগ পেলো না।

পেছনে একটা হুস্ হুস্ শব্দ তাকে উদগ্রীব করে তুললো।

অবাক হয়ে বনহুর পেছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলো একটা বিরাট আকার কচ্ছপ হুস্ হুস্ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

কচ্ছপের দেহটা একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মত লাগছে। সমস্ত দেহ শেওলা জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঢাকা মনে হচ্ছে। গলাটা উঁচু করে চার পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পিছু হটে একেবারে সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালো।

কচ্ছপটা বেশ উঁচুতে! সে চারপায়ে ভর করে বনহুরকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

কচ্ছপটার লক্ষ্য হলো বনহুর।

বুঝতে পারলো বনহুর কচ্ছপটা যদি তার দেহের উপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই। একেবারে পিষে থেতলে যাবে তার দেহটা।

কিন্তু কচ্ছপটা আর বিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে উবু হয়ে সরে দাঁড়ালো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে কচ্ছপটা লাফিয়ে পড়লো কিন্তু সে বনহুরের দেহে না পড়ে একেবারে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

বনহুর ফিরে তাকালো।

দেখলো কচ্ছপটা সমুদ্র গর্ভে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে গেলো।

বনহুর স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ফিরে দাঁড়ালো।

এগিয়ে চললো বনহুর দ্বীপটার উপরের দিকে।

নতুন এবং অদ্ভুত এ দ্বীপ।

উপরের দিকে তাকালো বনহুর।

আকাশটা ঠিক মাথার উপর মনে হচ্ছে।

সাদা সাদা মেঘগুলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নীল আকাশের কিছু কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। ভারী সুন্দর মনোরম দৃশ্য!

বনহুরের মনটা অনেকটা সচ্ছ মনে হচ্ছে। কারণ মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে। পাহাড় এবং ঝোপঝাড়, আগাছা, তারপর শুধু বালুকারাশি, সীমাহীন প্রান্তর।

বনহুর এগিয়ে চললো।

যদিও তার মনে বড় ইচ্ছা হচ্ছিলো একবার সর্পরাজ এবং পিঁপে মহারাজের মল্লযুদ্ধটা দর্শন করে কিন্তু সে সখকে দমন করে এগুলো বনহুর।

❑

হঠাৎ সর্দার নিখোঁজ হওয়ায় আস্তানার অনুচরগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো। এমন কি রহমান, কায়েস এদের কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় গেলো সর্দার।

রহমান, কায়েস এরা জানে আফ্রিকা থেকে সর্দার রওয়ানা দিয়েছিলো কিন্তু তারপর আর কিছু জানে না। ওয়্যারলেসে বারবার চেষ্টা করেছে

রহমান সর্দারের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র ওয়্যারলেস আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু যোগাযোগ হয়নি। রহমান ব্যর্থ হয়েছে।

এ কথা সত্য বনহুর তার ওয়্যারলেস যন্ত্রটি হারিয়ে ফেলেছিলো। যখন সে প্যারাসুট নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে পড়েছিলো তখন তার প্যান্টের পকেট থেকে ছিটকে পড়েছিলো নিচে সমুদ্র গর্ভে।

তাই আস্তানার সঙ্গে বনহুরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

কায়েস এবং রহমানও বহু চেষ্টা করেও সন্ধান পায়নি তাদের সর্দারের।

এমনভাবে নিখোঁজ বনহুর বহুবার হয়েছে তাই, বলে একেবারে কিছু না জানিয়ে গেলো সে কোথায়। সর্দার যখন আফ্রিকা বিমান বন্দরে বিমানে আরোহণ করেছেন তখনও তারা সংবাদ জানে, তারপর আর কিছুই জানে না।

এখানে বনহুরের আস্তানায় যখন বনহুরকে নিয়ে তার অনুচরগণ ভাবছে তখন বনহুর মংস্কো দ্বীপে এক নতুন অভিযানে লিপ্ত।

একটা সমতল স্থানে এসে দাঁড়াতেই বনহুর চমকে উঠলো। তার পায়ের নিচের বালুকারাশি যেন দুলে উঠলো। একটু একটু কাঁপছে বালুকারাশি তাতে সন্দেহ নেই।

বনহুর সজাগ হয়ে সরে দাঁড়ালো।

সরে দাঁড়াতেই তার মনে হলে সেখানেও পায়ের নিচের মাটি দুলছে। তবে কি ভূমিকম্প শুরু হলো!

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না।

বালুকারাশি উঁচু হয়ে উঠছে যেন।

ঠিক যেমন উই ঢিবি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তেমনি ফুলে উঠলো বালুকরাশির স্থানে স্থানে।

বনহুর সেখান থেকেও সরে গিয়ে একটা বৃহৎ আকার পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়ালো। দৃষ্টি তার রয়েছে সম্মুখে সেই ফুলে উঠা বালুকারাশির দিকে।

বিস্ময়কর ব্যাপার।

বালুকারাশি কিছুটা ফুলে উঠার পর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা জমকালো পদার্থ।

বনহুর ভালভাবে তাকিয়ে দেখছে।

বালুর উঁচু টিবিগুলোর ভেতর থেকে বেরুলো এক একটা গোলাকার মাথা এবং জ্বলজ্বলে দুটো করে চোখ। আরও একটু অপেক্ষা করার পর বনহুর হতভম্ব হলো। বালুকারাশির তলদেশ থেকে বেরিয়ে এলো এক একটা পিঁপে মহারাজের বাচ্চা।

হাত নেই, পা নেই, গোলাকার দেহ, শুধু দুটি চোখ। আর চোখের নিচের অংশে একটা মুখ।

অদ্ভুত জীব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে বনহুরের বুঝতে বাকি রইলো না সেই পিঁপে জীবটার বাচ্চা এগুলো।

জীবটা তাহলে বালুকারাশির মধ্যে ডিম প্রসব করে এবং তা থেকে বালুকারাশির মধ্যে জন্ম নেয় পিঁপের বাচ্চা।

একসঙ্গে প্রায় দশ-বারোটা বাচ্চা বেরিয়ে এলো।

পিঁপে বাচ্চাগুলো বেশ গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে।

এলোমেলোভাবে গড়াতে শুরু করলো।

তারপর এক একটা চলে গেলো এক একদিকে। কিছুক্ষণেই ফাঁকা হয়ে এলো জায়গাটা।

বনহুর সব অবাক চোখে দেখলো।

এমন বিস্ময়কর ব্যাপার ইতিপূর্বে তার সম্মুখে ঘটেনি। পিঁপে জীবের বাচ্চাগুলো এত দ্রুত বালুকারাশির মধ্য হতে বেরিয়ে এলো, আবার এত শীঘ্র তারা বেশ বড় হলো এবং উধাও হয়ে গেলো দ্রুতগতিতে।

কিন্তু এ সব নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই বনহুরের। কিছু খাদ্য তাকে সংগ্রহ করতে হবে যা খেয়ে এই নতুন অজানা দ্বীপে জীবন ধারণ করতে পারবে সে।

তারপর আসবে রাত্রি।

মহারাত্রি বলা যায়।

কারণ এমন ভয়ঙ্কর দ্বীপে রাত্রিযাপন কি যে ভীতিকর তা সবাই আন্দাজ করে নিতে পারবে।

বনহুর বালুকারাশি পেরিয়ে অনেকটা পথ চলে এলো, ঝোপঝাড় আগাছা নানা ধরনের অজানা অচেনা গাছপালা।

মাঝে মাঝে অচেনা জীবজন্তু নজরে পড়ছে তার।

বনহুরের সঙ্গে ক্ষুদে ওয়্যারলেস মেশিন ছিলো এবং ছিলো নানা ধরনের ক্ষুদে অস্ত্রশস্ত্র তবে রিভলভার তার সাথী বলা যায়।

ওয়্যারলেস মেশিনটা সাগরে পড়ে গেলেও রিভলভার ও আরও দু'একটা প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র মেশিন তার সঙ্গে এখনও রয়েছে। তাই বনহুর কিছুটা নিশ্চিত বটে।

আনমনে এগুচ্ছে বনহুর।

বেশ ক্ষুধা অনুভব করছে সে।

কিছু না খেলে শরীরটা নিস্তেজ হয়ে আসবে।

তবু চলেছে।

কিছু দেখছে না যা খেয়ে ক্ষুধা মেটানো যায়।

বনহুর পুনরায় সমুদ্রধারে ফিরে চললো।

তবে পূর্বের স্থানে নয়।

এ দিকটা সম্পূর্ণ আলাদা জায়গা।

উঁচুনীচু পাহাড়ের মত পাথরের খন্ড। পাথরখন্ডগুলোর ফাঁকে ফাঁকে শেওলা জমে আগাছার রূপ নিয়েছে।

বনহুর একটা পাথরে বসে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে তীরে পাথরখন্ডগুলোর উপরে।

সেকি ভীষণ শব্দ!

কানে তালা লাগার যোগাড়।

বনহুর তাকিয়ে আছে নির্বিকার দৃষ্টি মেলে। ভাবছে অনেক কথা, এই মংস্কো দ্বীপের নাম সে শুনেছিলো কিন্তু দেখেনি কোনোদিন। অদ্ভুত এ দ্বীপ, আর সে দ্বীপের জীবগুলো আরও অদ্ভুত।

বালির তলদেশ থেকে অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি হলো পিঁপে আকার জীবগুলোর বাচ্চা এবং এত তাড়াতাড়ি সেগুলো বেড়ে উঠলো যা সে কখনও দেখেনি। শুধু জীবগুলো বেড়েই উঠলো না, তারা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

বনহুর কতকটা আনমনা হয়ে পড়েছিলো, ঠিক ঐ সময় সমুদ্র তলদেশ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠলো একটা জমকালো বস্তু।

বনহুরের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

সে তাড়াতাড়ি একটা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে ফেললো। তার দৃষ্টি রয়েছে সম্মুখে সমুদ্রের দিকে কালো বস্তুটার উপর।

বস্তুটা ধীরে ধীরে মাথা তুলে দিচ্ছে উপরের দিকে।

বনহুর মনে করলো যে কালো বস্তুটা সমুদ্র গহ্বর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসছে সেটা নিশ্চয়ই কোনো জীবন্ত জীব।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলো বনহুর ঐ কালোমত বস্তুটা কোনো জীব নয়, একটা ডুবুজাহাজের মাস্তুল। বনহুর সজাগ হয়ে দাঁড়ালো, যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না তবু সে আড়ালে আরও নিবিড় হয়ে দাঁড়ালো।

চোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে, আড়ালে আত্মগোপন করে নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে তাকালো।

ততক্ষণে জমকালো বস্তুটা আরও বেশি উপরে জেগে উঠেছে। আরও একটু পর একেবারে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো একটা আশ্চর্য ধরনের জাহাজ। তবে হঠাৎ কেউ দেখলে ওটা জাহাজ বলে মনে করবে না। কোনো ডুবন্ত জীব বলেই মনে হবে।

কারণ জাহাজখানার কোনো জানালা বা ছিদ্রপথ ছিলো না।

সমস্ত বডি জমকালো চকচক কভারে ঢাকা।

সূর্যের তাপে জমকালো কভার ঢাকা জাহাজখানা ঝকমক করে উঠলো।

বনহুর তার পকেট থেকে বের করলো ক্ষুদে দূরবীক্ষণ যন্ত্রখানা! চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলো গভীর মনোযোগ সহকারে।

জাহাজখানা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ জেগে উঠলো সমুদ্রের বুকে। ঠিক কচ্ছপের আকার জাহাজখানা, বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

মাত্র কয়েক মিনিট, তারই মধ্যে আকাশে দেখা গেলো একটা প্লেন মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে ঠিক জাহাজখানার সোজা উপরে এসে চক্কর দিতে শুরু করলো।

অবাক হলো বনহুর।

কারণ এত অল্প সময়ে প্লেনখানা কি করে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছলো।

জাহাজের উপরিভাগটা কচ্ছপের পিঠের মত কিন্তু ঠিক উঁচু নয়। বেশ চেপ্টা ধরনের।

আকাশে বিমানখানা যখন চক্কর দিচ্ছিলো তখন জাহাজখানা স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

ধীরে ধীরে জাহাজখানার উপরের অংশ কিছুটা খুলে গেলো।

প্লেনখানা এবার আস্তে করে এসে জাহাজখানার ছাদে নেমে পড়লো।

বনহুর চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখছে।

যদিও সে সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরে তবু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো।

প্লেনখানা জাহাজটার উপরে নেমে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো প্লেনের দরজা।

ভিতর থেকে নেমে এলো তিনজন অদ্ভুত পোশাকপরা লোক।

বিস্ময়কর পোশাকে সজ্জিত তারা।

প্রত্যেক ব্যক্তির পিঠে এক একটা প্যাকেট বা বাক্স।

বনহুর লক্ষ্য করলো অদ্ভুত পোশাকপরা লোকগুলো প্লেন থেকে অবতরণ করে জাহাজের খোলসের মধ্যে প্রবেশ করলো।

তারপর পুনরায় যখন তারা বেরিয়ে এলো তখন দেখতে পেলো বনহুর অদ্ভুত পোশাক পরিহিত লোকগুলোর পিঠে সেই প্যাকেট অথবা বাক্সগুলো বাঁধা নেই।

তারা প্লেনের সিঁড়ি বেড়ে উপরে উঠে পড়তেই সিঁড়ি গুটিয়ে প্লেনের তলদেশে প্রবেশ করলো।

আশ্চর্য ধরনের সিঁড়ি বনহুর এই প্রথম দেখলো।

সবচেয়ে বনহুর বেশি অবাক হলো প্লেন থেকে যে লোকগুলো অবতরণ করলো তারা নীরবে কাজ করে গেলো, কোনো কথা কেউ বলছে না বা বললো না।

প্লেনে ওরা চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনখানা আকাশে উড়ে উঠলো, এবার জাহাজখানা পুনরায় ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলো সমুদ্রের গভীর অতলে।

বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, নিশ্চয়ই এখানে এই সমুদ্র গহ্বরে লুকিয়ে আছে কোনো গভীর রহস্য।

জাহাজখানা ঠিক্ কচ্ছপের মত দেখতে।

পিঠে একটা ঢাকনা।

তবে জাহাজখানা সমুদ্র গহ্বরে তলিয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে তার পিঠের ঢাকনা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু জাহাজে কোনো ব্যক্তি নজরে পড়লো না, বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

বনহুর দেখছে প্লেনখানা আকাশে মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আর জাহাজখানা তলিয়ে গেলো সমুদ্রগর্ভে।

গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো বনহুর।

সে ভাবতেও পারেনি মংস্কো দ্বীপে তাকে এভাবে গভীর এক রহস্য আচ্ছাদন করে ফেলবে।

অনেক ভেবেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলো না বনহুর। জাহাজখানা যে রহস্যময় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তেমনি প্লেনখানাও রহস্যজনক। হঠাৎ জাহাজখানা ভেসে উঠলো তার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ভেসে উঠলো প্লেনটা। নিশ্চয়ই জাহাজখানার সঙ্গে প্লেনটার সংযোগ আছে।

কিন্তু কিসের সংযোগ?

কি আছে ঐ জাহাজে?

আর প্লেনখানা থেকে যারা অবতরণ করলো তারাই বা কারা আর কিই বা তাদের পিঠের প্যাকেটে বাঁধা ছিলো।

❑

আশা জাভেদের পিঠে হাত রেখে বললো—রহস্যময় বীণার সন্ধান তোমাকে করতেই হবে। ঐ বীণার মধ্যে আছে এক অমূল্য সম্পদ। যা সাত রাজার ধনের চেয়েও মূল্যবান।

বললো জাভেদ—আমি বহু সন্ধান করেছি কিন্তু সেই বিস্ময়কর বীণার সন্ধান পাইনি।

আমি জানি সেই বীণা কোথায় আছে তবে তার সন্ধান জানতো তোমার বাপুজী।

জাভেদ আনমনা হয়ে পড়লো।

বললো আশা—তোমার বাপুজী আজও ফিরে আসেনি তবে সে আফ্রিকা বিমান বন্দর ত্যাগ করেছে এটা ঠিক।

জাভেদ বললো—আমি সন্ধান নিয়ে জানতে পারলাম বাপু ঐ দিনই ঐ প্লেনে চলে এসেছে।

আমি জানি জাভেদ।

আশা আম্মু, বাপুজী তাহলে কোথায় গেলো?

তা নিয়ে আমিও ভাবছি। তবে জানি সে কোনো এমন জায়গায় রয়েছে যেখান থেকে তোমার আমার কাছে কোনো সন্ধান পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু বাপুতো নিশ্চুপ থাকার লোক নয়—

সেকথা সত্য জাভেদ, তবে আমার মন বলছে নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছে—নইলে কথা শেষ করতে পারলো না আশা।

জাভেদ সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বললো—আশা আম্মু, তুমি আদেশ করো আমি বাপুর সন্ধানে আফ্রিকা গমন করি?

না।

কেন তুমি বারণ করছো?

জানি তুমি তার সন্ধান পাবে না।

তাহলে?

বনহুরকে কেউ বন্দী করতে পারবে না এটা আমি জানি। সে যেখানেই থাক ফিরে আসবেই। আশার মন চলে যায় দূরে অনেক দূরে কোনো এক অজানা দেশে যেখানে বনহুর হয় বন্দী অবস্থায় রয়েছে নয় মুক্ত বিহঙ্গের মত বিচরণ করে ফিরছে।

বললো জাভেদ—আশা আম্মু!

বলো?

বাপুর সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয় বলবে আমাকে?

ঠিক মনে নেই তবে দীর্ঘ সময়।

বাপুকে তুমি বড্ড ভালবাসো, তাই না?

জাভেদের কথায় আশার মুখমন্ডল রাঙা হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লো আশা, বললো সে—জাভেদ, তুমি আর কতদিন আম্মুকে ছেড়ে আমার কাছে থাকবে বলো?

যতদিন আমার মন চাইবে ততদিন আমি তোমার কাছে থাকবো। কিন্তু তোমাকে আজ বলতেই হবে আশা আম্মু, তুমি আব্বুকে ভালোবাসো কিনা?

পাগল ছেলে, তোমার বাপুকে ভালো না বাসলে তোমাকে কি আপন করে নিতে পারতাম? তাকে ভালবাসি বলেই তো তোমাকে আমি নিজ সন্তানের মত মনে করি—

আশা আম্মু!

জাভেদ, তোমার বাপু আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা, আমার ধ্যান। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে আশার কণ্ঠ, সে দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে।

জাভেদ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর একটু হেসে চলে যায় সেখান থেকে। কিন্তু মন থেকে তার আশা আম্মুর সেই মুহূর্তের মুখচ্ছবি মুছে যায় না। কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে তার কথাগুলো।

জাভেদ এগিয়ে এসে ঝর্ণার পাশে দাঁড়ালো।

পাহাড়িয়া ঝর্ণাধারা কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

জাভেদ ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়াতেই কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো জাভেদ।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো সে, এই গভীর জঙ্গলে শুধু বাস করে আশা আর সে। কোনো মানব এখানে নেই, দেখেওনি কোনোদিন। এ জঙ্গলটা বড় নির্জন। এমন কি হিংস্র জীব জন্তুও বড় একটা দেখা যায় না।

কে এই ব্যক্তি যার দেহে বাঘের চামড়ার বর্ম। পায়ে অদ্ভুত ধরনের পা-বন্দ। হাতে এবং মাথায় চামড়ার আচ্ছাদন।

বয়স তার জাভেদের কাছাকাছি না হলেও কিছুদিনের বড় হবে।

চোখ দুটো লাল টকটকে।

দীর্ঘ গোফ নাকের দুপাশে ঝুলে পড়েছে লম্বালম্বি হয়ে।

জাভেদ ফিরে তাকাতেই সেই অদ্ভুত ব্যক্তিটি এক বজ্রঘুষি বসিয়ে দিলো জাভেদের চোয়ালে।

জাভেদ কিছু বুঝবার পূর্বেই চোয়ালে ঘুষির আঘাত খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলো সে। শান্ত সিংহশাবক যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তেমনি জাভেদ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর সে ভাল করে তাকালো নতুন আগন্তুকটার দিকে।

দক্ষিণ হাতখানা তার মুষ্ঠিবদ্ধ হলো। কালবিলম্ব না করে ভীষণ এক মুষ্ট্যাঘাৎ বসিয়ে দিলো জাভেদ সেই নতুন আগন্তুকটার নাকে।

সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঝরণার পানিতে।

জাভেদের বজ্রমুষ্ঠির আঘাতে আগন্তুক লোকটার নাক দিয়ে লাল টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। ঝরণার পানি লালে লাল হয়ে উঠলো।

জাভেদ ঝরণায় নেমে ওর কাঁধ ধরে টেনে তুললো, তারপর পুনরায় আর এক বজ্রমুষ্ট্যাঘাৎ।

কিন্তু এবার আগন্তুক ছিটকে পড়লো না, সে টাল সামলে নিয়ে আক্রমণ করলো জাভেদকে।

ঝরণার ধারে শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ।

জাভেদ যেমন তেমনি নতুন শত্রুটা।

কারও দেহে শক্তি কম নয়।

জাভেদও নিরস্ত্র তেমনি আগন্তুকটাও অস্ত্রহীন।

দু'জনের মধ্যে চললো মল্লযুদ্ধ।

উভয়েরই নাকমুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

সেকি ভীষণ যুদ্ধ!

হঠাৎ পড়ে গেলো আগন্তুকটা, নিচে ছিলো একটা পাথরখন্ড।

আগন্তুকের মাথাটা ভয়ংকরভাবে থেতলে গেলো।

রক্তে লাল হয়ে উঠলো শুকনো সাদা পাথরখন্ডটা। বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলো ওর দেহটা।

জাভেদ হিংস্র জন্তুর মত নিজের বুকে আঘাত করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। তারপর তুলে নিলো কাঁধে ওর রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটা।

ফিরে এলো।

উঠানে এসে ডাকলো জাভেদ—আশা আম্মু...

ডাক শুনে বেরিয়ে এলো আশা।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো ভীষণভাবে।

জাভেদের কাঁধে একটা রক্তাক্ত দেহ।

আশা দ্রুত এসে দাঁড়ালো জাভেদের পাশে, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—একি, এর এ অবস্থা কেন? একে কোথায় পেলে জাভেদ?

জাভেদ কাঁধ থেকে প্রাণহীন দেহটা মাটিতে নিক্ষেপ করে বললো—আশা আম্মু, তোমার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। তাই ওকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছি।

আশা ঝুঁকে পড়লো মৃতদেহটার মুখের উপর। আশ্চর্য কণ্ঠে বললো—জাভেদ এই তরুণকে হত্যা করে তুমি ভুল করেছো, কারণ এর চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারছি এ জাম্বুরীদের লোক। বড় ভয়ংকর হিংস্র এরা।

জাভেদ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো—তার চেয়েও বেশি হিংস্র আমি। আশা আম্মু, আমি ওকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছি।

কিন্তু জানো এর পরিণতি কত সাংঘাতিক...

আমি কোনো কিছুকে ভয় করি না আশা আম্মু।

জাভেদ, এর পোশাক পরিচ্ছদে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি তাতে একেবারে সঠিক যে, এ তরুণ হিরু পর্বতের বাসিন্দা সর্দার নরসিংয়ের বংশধর।

তাতে আমার কি?

হাঁ, তাতে তোমার কিছু নয়, আমারও নয়! একটু থেমে বললো আশা—ভয় আমিও করি না জাভেদ। তবে তোমার জেনে রাখা ভাল, কারণ সব সময় সাবধানে চলাই শ্রেয়।

পুনরায় হাসিতে ফেটে পড়লো জাভেদ।

আশা দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জাভেদের মুখের দিকে। এ যে একেবারে স্বয়ং দস্যু বনহুরের প্রতিচ্ছবি। সেই নাক, মুখ, চোখ, সেই বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ। হাসলে বড় সুন্দর লাগে বনহুরকে, তেমনি বড় সুন্দর লাগে জাভেদকে।

জাভেদ হাসি থামিয়ে বলে—অমন করে কি দেখছো আশা আম্মু।

তোমার মুখ।

কেন, আমাকে এই কি প্রথম দেখছো?

যত দেখি ততই তোকে দেখতে ইচ্ছা করে।

জানি তুমি আমাকে বেশি ভালবাসো। কিন্তু আশা আম্মু, তুমি আমাকে যত আদর কর তার চেয়ে বেশি আমি আদর করি তোমাকে, কারণ তুমি আমার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করোনি তাই...

হাসলো আশা।

একটু পর বললো—যাও জাভেদ, মৃতদেহটাকে দূরে ফেলে দিয়ে এসো।

জাভেদ আশার আদেশ পালন করলো।

লাশটা তুলে নিলো কাঁধে, তারপর চলে গেলো গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো জাভেদ।

হিংস্র জন্তু তার শত্রুকে পরাজিত করার পর যেমন উল্লসিত হয় তেমনি জাভেদকে মনে হচ্ছিলো।

আশা বসে ছিলো।

তার দেহে শিকারের ড্রেস।

জাভেদ ফিরে এসে বললো—তোমাকে এভাবে প্রস্তুত দেখছি কেন?

বললো আশা—বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। জাভেদ, তুমি মনে করোনা জাম্বুরী সর্দার আমাদের উপর আক্রমণ না চালিয়ে শান্ত থাকবে।

এ তুমি কি বলছো আশা আম্মু!

হাঁ, যাকে তুমি হত্যা করেছো তাকে আমি না চিনলেও আমি জানি ও জাম্বুরী সর্দারের লোক। জাম্বুরী সর্দার যখন জানতে পারবে তার লোককে

তুমি হত্যা করেছো তখন যুদ্ধে বাধবে। সে যুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমি সর্বদা প্রস্তুত আছি।

শোন জাভেদ, এবার আসল কথা শোন।

বলো?

সেই বীণা তোমাকে উদ্ধার করতে হবে, যে বীণা মিস বার্বারা হীরা পর্বতে তোমার বাপুর হাতে অর্পণ করেছিলো।

আমি জানি!

কিন্তু...

আশা আম্মু, আমি যেমন করে হোক ঐ বীণা খুঁজে বের করবোই।

বেশ।

আমি চললাম।

শোন, ঐ বীণা তোমার বাপু রহমানের হাতে সমর্পণ করে রহমান সেই বীণা কি করেছে সেই জানে, কাজেই ঐ বীণা উদ্ধার করতে হলে রহমানের সহায়তা দরকার। একটু থেমে বললো আশা—জাভেদ, ঐ বীণার মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা আমি জানি।

সত্যি তুমি জানো?

হাঁ এসো আমরা নিভৃত স্থানে বসে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি। কারণ তোমার জানা দরকার।

আশা আর জাভেদ এসে বসলো একটা গাছের গুঁড়ির উপরে।

বহুকালের পুরোন গাছটা বাঁকা হয়ে পড়েছিলো। গাছের গুড়িটা ছিলো ঠিক কোনো একটা গোলাকার আসন বা ঐ ধরনের কোনো বস্তুর মত।

আশা আর জাভেদ পাশাপাশি বসে পড়লো। বললো আশা—মিস বার্বারা ছিলো মিশরের কোনো এক ধনী ব্যক্তির দুহিতা। সে একদিন জানতে পারলো তার পিতা তাঁর সম্পূর্ণ সম্পত্তি কোনো এক প্রতিষ্ঠানকে দান করবেন। কথাটা শোনার পর সে উন্মত্ত হয়ে উঠলো, পিতার সম্পত্তির মোহ তাকে উন্মাদ করে তুললো। মিস বার্বা মনে মনে ঠিক করলো তার পিতাকে হত্যা করে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে।

বললো জাভেদ—তারপর?

তারপর পিতা জানতে পারলো সবকিছু, তার কন্যা তাকে হত্যা করে সম্পত্তি নিজ আয়ত্তে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন পিতা তার সমস্ত সম্পত্তি, বিক্রি করে কোটি কোটি টাকার মূল্যবান মণিমুক্তা কিনে হীরা পর্বতের কোনো এক গুহায় রেখে দিলো এবং নিজে পথ ভুলে যাবার সম্ভাবনা স্মরণ করে একটা ক্ষুদ্র টেপরেকর্ডে এ পথের নির্দেশ রেখে বীণার মধ্যে লুকিয়ে রাখলো টেপরেকর্ড যন্ত্রখানা।

জাভেদ বললো—হুঁ, আমি সব বুঝতে পেরেছি। বীণার রহস্য এবার আমার কাছে উদ্‌ঘাটন হয়ে গেছে।

জাভেদের কথা শেষ হয় না, হঠাৎ একটা তীর এসে বিদ্ধ হয় জাভেদ আর আশার মাঝামাঝি।

জাভেদ আর আশা ফিরে তাকাবার পূর্বেই তাদের চারপাশ ঘিরে ফেলে অসংখ্য জাম্বুরী। প্রত্যেকের হাতে এক একটা বর্শা আর তীরধনু।

আশা শুধু ইংগিত করলো।

জাভেদ বুঝতে পারলো এরা জাম্বুরী, যাদের কথা আশা কিছু পূর্বে বলেছিলো তাকে। জাভেদ আরও বুঝলো জাম্বুরীরা ঠিক তাদের অনুচরটার লাশ দেখে ফেলেছে। যদিও সে অতি সাবধানে লাশটাকে ফেলে দিয়ে এসেছিলো।

এখন উপায়, জাম্বুরীরা এক একজন যেন দৈত্যরাজ।

জাভেদ আর আশাকে ওরা ধরে ফেললো।

বেঁধে ফেললো কঠিন রশি দিয়ে।

জাভেদকে যে মুহূর্তে রশি দিয়ে ওরা বাঁধতে গিয়েছিলো সেই দন্ডে একটা মল্লযুদ্ধ শুরু হতো কিন্তু আশার ইংগিত তাকে ক্ষান্ত করেছে।

জাম্বুরীগণ আশা আর জাভেদকে বেঁধে নিয়ে চললো।

জাভেদ হিংস্র জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করছিলো। সে সুযোগ সন্ধান করছিলো কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাভেদ ঠিক বনহুরের মতই দুঃসাহসী, কাজেই তাকে আটকে রাখা সাধ্য কার।

জাম্বুরীরা যখন ওদের দু'জনকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন জাভেদ লক্ষ্য করছিলো তার অশ্বটি দূরে তাদেরকে অনুসরণ করছে।

জাভেদ ও আশাকে নিয়ে জাম্বুরীদল যখন উঁচু একটি টিলা পার হচ্ছিলো তখন হঠাৎ জাভেদ এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিলো। শিষ দিয়ে ছুটে গেলো টিলার ধারে, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়লো নিচে।

টিলার নিচেই ছিলো জাভেদের অশ্ব, কারণ অশ্বটি জাভেদকে লক্ষ্য রেখে তাদের সঙ্গে এগুচ্ছিলো। জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়লো।

তারপর কে পায় জাভেদকে।

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাম্বুরীগণ বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগলো তাকে লক্ষ্য করে কিন্তু জাভেদ মুহূর্তে তাদের বর্শার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

জাম্বুরীগণ বিমুখ হয়ে ফিরে এলো টিলার কিনারা থেকে।

ওরা আশাকে আরও মজবুত করে বেঁধে ফেললো এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো।

আশা কোনো বাধা দিলো না।

❑

বনহুর বুঝতে পারলো এরা কোনো মহাচক্রী যাদের ক্ষমতা রয়েছে সীমাহীন। ডুবু জাহাজখানা আশ্চর্যই শুধু নয়, একেবারে বিস্ময়কর। বনহুর ভেবে নিলো যেমন করে হোক এই মহাচক্রের রহস্য তাকে উদঘাটন করতেই হবে।

বনহুর ভীষণ ক্ষুধা অনুভব করছে।

এমন এক দ্বীপে বনহুর এসে পৌঁছেছে যে দ্বীপে মানুষের খাদ্য বলে কিছু নেই। তেমন কোনো ফলযুক্ত বৃক্ষ নজরে পড়ছে না।

সমুদ্রে পানির অভাব নেই কিন্তু সে পানি পান করা অসম্ভব। সুপেয় পানির প্রয়োজন। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, জাহাজখানা ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর অতলে।

বনহুর এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্যের তাপ বাড়ছে।

বনহুর ক্লান্ত হয়ে আসে, তবু সে সন্ধান করে ফিরছে। যদি এই গভীর রহস্যের কোনো কিনারা করা যায়।

বেলা শেষ হয়ে আসে।

হতাশ হয়ে পড়ে বনহুর।

না জানি আবার কোন্ বিপদ ওৎ পেতে আছে তার জন্য।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

বনহুর একটা সমতল স্থানে হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। পিস্তলখানা পকেটে ঠিক স্থানে আছে কিনা একবার দেখে নিলো, তারপর নিশ্চিন্তভাবে চোখ বন্ধ করলো।

মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছে।

একটা শব্দ কানে এলো বনহুরের।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো সে, হঠাৎ পাশেই একটা পাথর নড়ে উঠলো।

বনহুর ক্ষিপ্তগতিতে স্থান ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর দ্রুত আত্মগোপন করলো।

সরে দাঁড়াতেই তার নজর পড়লো ওপাশে পর্বতমালার মত উঁচু স্থানে একটা পর্বতের পাশের কিছু অংশ সরে গেলো আস্তে আস্তে। একটা গুহামুখ বেরিয়ে এলো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গুহামুখটা।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করে চললো গুহামুখ হতে কেউ বের হয় কিনা। কিন্তু বেশ কিছু সময় কেটে গেলো কোনো জনপ্রাণী ঐ গুহামুখ থেকে বের হলো না।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে বনহুর তাকিয়ে আছে, হঠাৎ পর্বতমালার কিছু অংশ ফাঁক হয়ে গেলো, তারপর গুহামুখ বেরিয়ে এলো কিন্তু কোনো কিছু নজরে আসছে না, ব্যাপার কি?

বনহুর এদিক ওদিক লক্ষ্য রেখে সোজা চলে এলো ঠিক যে উঁচু পর্বতটার গায়ে গুহামুখ বেরিয়েছিলো সেই জায়গায়। ভিতরে একটা সুড়ঙ্গপথ আছে বলে মনে হলো।

বনহুর কিছু চিন্তা করলো তারপর প্রবেশ করলো সেই বিস্ময়কর সুড়ঙ্গে।

বনহুর সুড়ঙ্গ বা গুহায় প্রবেশ করতেই সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখের পাথরখানা সরে এলো এবং গুহামুখে বন্ধ হয়ে গেলো। বনহুর চমকে একপাশে সরে দাঁড়ালো। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো তাকে কেউ লক্ষ্য করছে, নাহলে এভাবে গুহামুখ বন্ধ হয়ে যেতো না।

এখন কি করা যায়।

বনহুর গুহামধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বমুহূর্তে ঐ চিন্তাই করেছিলো। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা থেকে বিরত না থাকাই ভাল এবং এ জন্য যদি মৃত্যুও ঘটে তাতে কোনো দুঃখ বা ক্ষোভ থাকবে না।

বনহুর তাই সোজা প্রবেশ করলো সেই অদ্ভুত গুহায়।

প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে বন্ধ হয়ে গেলো গুহা বা সুড়ঙ্গমুখ। বনহুর হকচকিয়ে গেলো, চমকে পিছন ফিরে তাকালো কিন্তু আর কোনো উপায় নেই গুহামুখ খুলবার।

তবু বনহুর একবার এগিয়ে এসে ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিলো, অমনি বনহুরের পায়ের তলা থেকে সরে গেলো মেঝেটা।

বনহুর পড়ে গেলো কোনো এক গর্তের মধ্যে।

ঝাপসা অন্ধকার।

বনহুর তাকালো চারিদিকে।

তার চার পাশে সুউচ্চ দেয়াল।

বনহুর উপরে তাকালো।

জমাট অন্ধকার মনে হচ্ছে উপরের দিকটা।

কড়কড় শব্দ হচ্ছে।

একপাশের দেয়াল এগিয়ে আসছে তার দিকে।

দেয়ালখানা এগিয়ে এসে অপর দেয়ালের সঙ্গে মিশে যাবে, তাহলে থেতলে চেপটা হয়ে যাবে বনহুরের দেহটা।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করছে।

এখন কি তার করণীয়?

নিজকে বাঁচাবার কোনো পথ নেই।

বনহুর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

ততক্ষণে দেয়ালটা একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে। বনহুর ভেবে পায় না এমন অজানা এক দ্বীপে এমন বিস্ময়কর গুহা এবং গুহার মধ্যে রহস্যময় মৃত্যুকূফ কি করে এলো। বনহুর দু'হাতে দেয়ালখানা ঠেলে ধরলো, প্রাণপণ শক্তিতে কিন্তু দেয়ালখানা তাকে ঠেলে-নিয়ে আসছে।

বনহুর বুঝতে পারলো কেউ অন্তরালে থেকে কাজ করছে। এই নির্জন অজানা দেশে কে তার এমন শত্রু আছে যার সঙ্গে তার কোনো দিন সংঘর্ষ বেঁধেছিলো। বনহুর মরিয়া হয়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

আর রক্ষা নেই।

মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করবে।

বনহুর প্রাণপণে দেয়ালটাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, সমস্ত শরীর তার ঘামে ভিজে চুপসে উঠলো। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড হঠাৎ তার কানে এলো অট্টহাসির শব্দ। কি ভয়ংকর সে শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো দেয়ালখানা।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

যাক উপস্থিত মৃত্যু থেকে রেহাই পেলো।

সে উপরের দিকে তাকালো।

কিন্তু কিছুই নজরে পড়ছে না।

শুধু জমাট অন্ধকার।

অট্টহাসি থেমে গেছে।

বনহুর ভেবে পাচ্ছে না ব্যাপারখানা কি?

নিশ্চয়ই মহাচক্র রহস্য ঘনীভূত হয়ে আসছে। এখানে কোনো কুচক্রী আস্তানা গড়ে বসে আছে যা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে।

বনহুর খুশি হলো।

মরণকে সে ভয় করে না।

জীবন দিয়ে সে এই রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করবে। সেই ডুবুজাহাজখানার কথা মনে পড়লো। সেই প্লেনখানার কথাও স্মরণ হলো, সব যেন কেমন এক মহাচক্র—

বনহুরের চিন্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, দেয়ালটা আবার সরে আসছে বলে মনে হলো তার। বনহুর লক্ষ্য করলো একটা সুমিষ্ট গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করছে।

বনহুর বুঝতে পারলো আর রক্ষা নেই তার নিশ্বাসে কোনো বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করা হলো, এক্ষুণি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে সে, তারপর তাকে পিষে থেতলে হত্যা করা হবে বনহুর মেঝেতে বসে পড়লো তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন দেখলো চারিদিকে শুধু অন্ধকার। কোনো সাড়াশব্দ নেই, মনে হলো সে মৃত্যুবরণ করেছে।

স্মরণ হলো সেই দেয়ালের কথা।

ভয়ংকর কঠিন একটা দেয়াল এগিয়ে আসছে। মৃত্যুদূতের মত, কিছুতেই সে ঠেকাতে পারছে না। তারপর একটা সুমিষ্ট গন্ধ। তারপর কিছু স্মরণ নেই—তাহলে কি তার মৃত্যু ঘটেনি? বনহুর হাত দিয়ে মাথার চুল স্পর্শ করলো। হাঁ, সে জীবিত আছে। মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করেনি।

বনহুর শুয়ে আছে কঠিন শক্ত মেঝেতে তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো। তবে কি সেই জায়গা—সেই চারপাশ দেয়াল-বেষ্টিত মৃত্যু কূপ—হাঁ, তাই হবে। তাহলে দেয়ালটা তাকে পিষে থেতলে দেয়নি?

বনহুর উঠে বসলো।

হাতড়িয়ে অনুভব করে নিলো সবকিছু।

হঠাৎ হাতে কোনো একটা শক্ত বস্তু অনুভব করে সজাগ হয়ে উঠলো।

বস্তুটা মেঝের সঙ্গে মজবুত করে আটকানো।

কোনো একটা প্যাঁচ জাতীয় জিনিস সেটা।

হঠাৎ বনহুরের মনে একটা আশার সঞ্চার হলো নিশ্চয়ই এটা কোনো এমন বস্তু হবে যা দিয়ে তার উদ্ধারের পথ পাওয়া যেতে পারে।

বনহুর বস্তুটা বেশ ভালভাবে নেড়েচেড়ে দেখলো।

তারপর ঘোরাবার চেষ্টা করলো বস্তুটাকে।

হঠাৎ নড়ে উঠলো বস্তুটা।

সঙ্গে সঙ্গে একপাশের দেয়াল ফাঁক হয়ে গেলো যাদুমন্ত্রের মত। বনহুর দেখলো সুন্দর একটা দরজা।

হঠাৎ এমন একটা পথ তার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি বনহুর।

এখনও বনহুর বসে ছিলো মেঝেতে।

দরজার ওপাশে কিছুটা আলোর ছটা নজরে পড়লো। এপাশ জমাট অন্ধকারে ভরা, কাজেই সামান্য আলোর আভাস তাকে সজাগ করে তুললো।

মাথা উঁচু করে দেখে নিলো।

তারপর উঠে দাঁড়ালো মেঝেটার উপর।

মাথাটা কিছু ঝিমঝিম করলেও তার বেশি কষ্ট হচ্ছে না তবে ক্ষুধা আর পিপাসা বেশ অনুভব হচ্ছে।

বনহুর কোনো দিকে খেয়াল না করে সোজা ঐ উন্মুক্ত পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

যেমনি বনহুর পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে অমনি সে দেখতে পেলো সামনে একটা ঝুলন্ত লিফট।

বনহুর সেই লিফটে উঠে দাঁড়িয়ে লিফটের দেয়ালে সুইচে চাপ দিলো, লিফট সা সা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বনহুর প্রতীক্ষা করছে।

না জানি লিফটখানা তাকে কোথায় নিয়ে পৌছবে। বনহুর তার ক্ষুদে পিস্তলখানা বের করে নিলো। লিফটখানা তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ থেমে গেলো। কিন্তু যে স্থানে এসে লিফটখানা থেমে গেলো সে স্থানটি গভীর শূন্য। একেবারে মহাশূন্য যাকে বলে, কিছু নজরে পড়ছে না।

বনহুর লিফট থেকে নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

একটু আশংকিত হলো সে, কারণ নিচে কিছু নজরে আসছে না।

লিফটখানার কোনো দেয়াল নেই, বা কোনো আবরণ আচ্ছাদন নেই। সামান্য পা রাখার জায়গা ছাড়া আর কিছু নেই! বনহুর ভাবছে, হঠাৎ আবার সেই হাসির শব্দ।

ভীষণ আর ভয়ংকর সেই আওয়াজ।

এটা কি মানুষের কণ্ঠস্বর না কোনো যান্ত্রিক আওয়াজ। ভালভাবে কিছু ভাবতে পারে না বনহুর।

অট্টহাসির শব্দ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিফটের তলদেশ খসে পড়লো।

বনহুর দ্রুত ধরে ফেললো লিফটের নিচের অংশের একটা দিক। তাই রক্ষা নাহলে মহাশূন্যের গভীরদেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো তার দেহটা।

বনহুরের দক্ষিণ হাতে ছিলো পিস্তলখানা।

বাম হাতে সে ধরে ফেলেছিলো লিফটের নিচের অংশ। এবার বনহুর পিস্তলখানা ঝুলন্ত অবস্থায় পকেটে রেখে দু'হাতে শক্ত করে ধরে লিফটের খোলা অংশ।

লিফট নামছে।

নিচে নামছে।

হঠাৎ নিচে মহাশূন্যে আলোর ছটা পরিলক্ষিত হলো। বনহুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভীষণ চমকে উঠলো, মহাশূন্য বলে এতক্ষণ যা ধারণা করেছিলো তা নয়। নিচে ভীষণ আকার সূতীক্ষ্ণ লৌহফলা থরে থরে সাজানো রয়েছে। কোনোক্রমে বনহুরের হাত একবার শিলিথ হলেই মৃত্যু এবং সে মৃত্যু অতি ভয়ংকর।

নিচে সূতীক্ষ্ণ ধারালো ফলাগুলো আলোর ছটায় চক চক করছে।

আলোর ছটাটা কোথা থেকে আসছে বলা যাচ্ছে না।

বড় উজ্জল আলোর ছটা।

বনহুর ঝুলছে।

লিফট নামছে।

এক সময় এসে তার দেহটা ধাক্কা খাবে সূতীক্ষ্ণ ফলাগুলোর সঙ্গে। গেঁথে যাবে তার দেহটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর অমনিভাবে আর কতক্ষণ ধরে রাখবে লিফটের নিচের খোলা অংশটা। হাত দু'খানা আরষ্ট হয়ে আসছে। এবার তাকে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যু বরণ করতে হলো।

লিফটখানার যে অংশ বনহুর এতক্ষণ ধরে রেখেছিলো এবার সে অংশ খুলে যাবার উপক্রম হলো। আবার বনহুর এঁটে ধরলো অপর অংশ।

আশ্চর্য ঐ অংশ ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত লিফটখানা থেমে গেলো। একটুও নড়ছে না আর। বনহুর দেখলো নিচের সূতীক্ষ্ণ ধার ফলাগুলো ক্রমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছে।

মাত্র কয়েক মিনিট তার মধ্যেই নিচের সেই ফলাগুলো বিলুপ্ত হলো অথবা প্রবেশ করলো কোনো বস্তুর মধ্যে। আর কতক্ষণ বনহুর ধরে রাখবে লিফটখানা, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে হাতে।

এবার নিচে তাকিয়ে দেখলো সূতীক্ষ্ণ ফলাগুলো আর নজরে পড়ছে না।

বনহুর নিজের হাত দু'খানাকে মুক্ত করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়লো নিচে।

একটু পূর্বে যেখানে সূতীক্ষ্ণ ফলাগুলো ছিলো খোনে এখন সম্পূর্ণ সমতল।

বনহুর মোটেই আঘাত পেলো না।

যদিও লিফট থেকে নিচে মহাশূন্য বলে এক সময় মনে হচ্ছিলো এখন তা মহাশূন্য নয়। মেঝে কিন্তু পাথর নয়, শক্ত তক্তা বা ঐ জাতীয় কিছু হবে।

বনহুর নিচে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে ঘিরে ধরলো। পাঁচ ছ'জন লোক।

বিস্ময়কর মুখোশধারী লোকগুলো।

প্রত্যেকের হাতে এক একটা বিস্ময়কর অস্ত্র।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

চারপাশে লোকগুলো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কারও মুখে কোনো কথা নেই।

সবাই যেন যন্ত্রচালিত পুতুল।

বনহুর আবার শুনতে পেলো সেই অট্টহাসির শব্দ।

ঐ শব্দ ছাড়া বনহুর অন্য কোনো শব্দ এ পর্যন্ত শুনতে পায়নি। বনহুরের মনে পড়লো ডুবুজাহাজখানা ভেসে উঠার পর একটা প্লেন নেমে এসেছিলো জাহাজখানার উপরে।

তারপর প্লেনখানা নেমে পড়েছিলো জাহাজটার পিঠে তখন দেখেছিলো তিনজন অদ্ভুত পোশাকপরা লোককে নামতে এবং তাদের পিঠে ছিলো কোনো প্যাকেট...

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই বনহুরের, অস্ত্রধারীরা তাকে ঘিরে রেখেছে।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই একপাশে দরজার মত একটা সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো।

বনহুরকে সেই পথে যাবার জন্য ইংগিত করলো অস্ত্রধারী লোকগুলো।

বনহুর বিলম্ব না করে ওদের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

অজানা এক দ্বীপে নির্জন পর্বতমালার গহ্বরে এমন ধরনের রহস্যময় বেড়াজাল রয়েছে তা ভাবতেও পারে না বনহুর।

এরা কারা?

যারা ডুবু জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে গহ্বরে বিচরণ করে ফিরছে।

আর পর্বতমালার তলদেশে এরাই বা কারা।

সমুদ্রগর্ভে যে ডুবুজাহাজখানাকে বনহুর দেখেছে তাদের সঙ্গে এদের কোনো যোগাযোগ আছে কি না।

প্লেনে যারা এলো আবার চলে গেলো তারাই বা কারা। এসব নিয়ে বনহুর ভাবছে, যদিও তার চিন্তা করবার সময় এটা নয় তবু মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে তার।

বনহুর সেই নতুন গুহামুখ দিয়ে অস্ত্রধারীদের সঙ্গে এগিয়ে চললো। লোকগুলোর পোশাক যেমন বিস্ময়কর তেমনি বিস্ময়কর তাদের চালচলন!

অবাক হয়ে গেছে বনহুর।

তবু নীরবে এগিয়ে যাচ্ছে।

কেমন যেন এলোমেলো লাগছে সব।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর সে।

বনহুর একবার ভাবলো এদের কাবু করে সরে পড়বে কি না। কিন্তু ওদের হাতের অস্ত্রগুলো তার পরিচিত অস্ত্র নয় তাই একটু বিভ্রান্ত হলো।

দেখা যাক ভাগ্যে কি ঘটে।

বনহুর লোকগুলোর সঙ্গে চলেছে।

একটা সুড়ঙ্গপথ।

তেমন কোনো আশ্চর্যজনক কিছু নয়। বনহুরের সম্মুখে তিনজন পেছনে দু'জন।

বনহুর গুণে করে দেখে নিলো একবার।

নিজের পকেটে হাত রেখে তার ক্ষুদে মারাত্মক পিস্তলখানা অনুভব করে নিলো। শব্দহীন লক্ষ্যভেদ পিস্তল সেটা তার। বনহুর জানে সে পিস্তল থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। পিস্তলখানা তার অসময়ের বন্ধু বলা যায়।

সুড়ঙ্গপথ ধরে অনেক দূর এসে পড়লো।

সম্মুখে একটা প্রশস্ত গুহা।

গুহার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের মূর্তি।

মূর্তিগুলোর চোখ দুটো যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। বনহুর এমন ধরনের মূর্তি দেখেনি কোনোদিন।

সম্মুখে তাকিয়ে আরও অবাক হলো।

দেখলো একটা বিরাট আকার চেয়ারে বসে আছে সেই পিঁপে মহারাজ। তবে সেই পিঁপে মহারাজ কিনা তা সে জানে না কিন্তু অবিকল তেমনি মূর্তি।

বনহুরকে দেখামাত্র পিঁপে মহারাজ দুলে উঠলো।

চেয়ারখানা নড়ে উঠলো কাঁপুনি দিয়ে।

পিঁপেরাজ এবার অট্টহাসি হেসে উঠলো।

বনহুর বুঝতে পারলো এতক্ষণ বিভিন্ন স্থানে যে অট্টহাসির শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছিলো তা এই পিঁপে মহারাজের কণ্ঠের আওয়াজ।

বনহুর পিস্তলখানায় আর একবার হাত বুলিয়ে নিলো।

অস্ত্রধারীরা তখনও ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর তার পাশে দাঙায়মান অস্ত্রধারীকে লক্ষ্য করে হঠাৎ এক প্রচন্ড ঘুষি মারলো এবং এক ছটকায় কেড়ে নিলো তার হাতের বিস্ময়কর অস্ত্রখানা।

পিঁপে রাজ হেসেই চলেছে।

ভীষণ সে অট্টহাসি।

বনহুর পকেট থেকে পিস্তল বের করতে যাবে, অমনি বিস্ময়কর অস্ত্রধারীরা বনহুরকে ধরে ফেললো।

বনহুর এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলো নিজকে এবং প্রচন্ডভাবে ঘুষি চালালো। আশ্চর্য, ঘুষি খেয়ে অস্ত্রধারীরা এক একজন পড়ে গেলো মেঝেতে।

বনহুর দেখলো মেঝেতে পড়লো তারা আর উঠে দাঁড়ালো না। তবে কি ওরা প্রাণহীন, যান্ত্রিক মানুষ? সম্মুখে পিঁপে মানুষটা তখনও হেসে চলেছে।

অট্টহাসি।

বনহুর পিঁপে মানুষটাকে লক্ষ্য করে তার পিস্তল বের করে গুলী করলো।

সঙ্গে সঙ্গে পিঁপে মানুষটা গড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু একি, কোনো শব্দ পর্যন্ত হলো না বা এতটুকু রক্ত বেরিয়ে এলো না।

অট্টহাসি থেমে গেলো।

বনহুর ছুটে গিয়ে পিঁপে মানুষটার মুখের অবরণ খুলে ফেললো। স্পষ্ট দেখতে পেলো কোনো একটা যান্ত্রিক মুখ এবং ভিতরে সাউন্ডবক্স।

এতক্ষণে সবকিছু আন্দাজ করে নিলো বনহুর যারা তাকে আক্রমণ করেছিলো তাঁরা সত্যিকারের মানুষ নয় এবং এতক্ষণ যে অট্টহাসি শুনে আসছে তা এই পিঁপে মানুষটার কণ্ঠের আওয়াজ নয়। অত্যন্ত সুচতর কোনো দল আত্মগোপন করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই সেই দল তার কার্যকলাপ সব দেখেছে এবং সেইভাবে তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা কারা?

বনহুর মেঝেতে পড়া যন্ত্রচালিত মানুষগুলোকে পদাঘাত করে তাদের দেহের বর্ম খুলে ফেললো। একজনের দেহ থেকে খুলে নিলো তার বর্ম।

বনহুর সেই বর্ম পরে নিলো।

তারপর সম্মুখে এগিয়ে চললো।

কিন্তু কয়েক পা এগুতে না এগুতেই মূর্তিগুলো হেসে উঠলো একসঙ্গে, যেন যাদুপুরীর রহস্যময় কান্ড।

বনহুর তাকালো মূর্তিগুলোর দিকে।

মূর্তিগুলোর চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দাঁত বের করে হাসছে ওরা।

বনহুর মোটেই ঘাবড়ে গেলো না।

সে দ্রুত সেই গুহা থেকে বেরিয়ে পাশের গুহায় প্রবেশ করলো। ঐ মুহূর্তে দু'জন লোক উদ্যত রাইফেল হাতে সেই গুহায় এগিয়ে এলো।

বনহুর দেখলো ঐ গুহায় তার দেহে এখন যে পোশাক রয়েছে ঐ ধরনের পোশাকপরা বেশ কিছু যান্ত্রিক মানুষ দন্ডায়মান।

এই প্রথম জীবিত মানুষ বনহুরের নজরে পড়লো। সে দ্রুত যান্ত্রিক মানুষগুলোর সারিতে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং লক্ষ্য করতে লাগলো কি করে লোক দু'জন।

লোক দু'জন যে বনহুরকে সন্ধান করে ফিরছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর তার পূর্বেই নিজের পরিধেয় বস্ত্রের উপর পরে নিয়েছে। যান্ত্রিক মানুষগুলোর পরিধেয় খোলস, তাই যান্ত্রিক মানুষগুলোর সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ায় বনহুরকে সহসা চিনে নিতে পারলো না তারা।

ঠিক যান্ত্রিক মানুষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বনহুর। তাকে কেউ চিনতে পারবে না ঐ মুহূর্তে, কারণ তার মুখমন্ডল আচ্ছাদিত রয়েছে যান্ত্রিক মানুষগুলোর মুখোশ আবরণে।

লোক দুজনের চেহারা বনহুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তাদের চেহারা নিগ্রো জাতীয় এবং ভয়ংকর হিংস্র বলেই মনে হচ্ছে। বনহুর দেখলো তাদের হাতে এক একটা সরকি জাতীয় অস্ত্র। সরকির আগায় সূতীক্ষ্ণ ধারালো লৌহশলাকা। গুহার স্বল্প আলোতে বেশ স্পষ্ট নজরে পড়ছে সবকিছু।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লোক দুজনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। তারা চলে গেলো পাশের গুহায়, সেখানে সূতীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করে দেখলো সবকিছু।

হয়তো বা আগন্তুকটাকেই তারা খুঁজে ফিরছে। বেশ কিছুক্ষণ পাশের গুহার সন্ধান করার পর ফিরে এলো তারা এ গুহায়। যান্ত্রিক মানুষগুলোর মধ্যে খুঁজলো ভালভাবে।

বনহুর বুঝতে পেরে নিখুঁতভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক যেমনটি করে গোছানো আছে যান্ত্রিক মানুষগুলো।

লোকগুলো বেরিয়ে গেলো। যাবার পূর্বমুহূর্তে একটা হ্যান্ডেল ঘোরালো, সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক মানুষগুলো চলতে শুরু করলো।

ভীষণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

তবু বনহুর ঘাবড়ালো না, সেও ঠিক যান্ত্রিক মানুষগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলো।

সবগুলো নয় মাত্র কয়েকজনকে সঙ্গী করে নিয়ে চললো ওরা। সেই গুহা থেকে বেরিয়ে চলছে, অদ্ভুতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে যেন এক একটা সত্যিকারের মানুষ।

বনহুরও কম নয়, সেও যান্ত্রিক মানুষগুলোর মত কাজ করছে।

সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

লম্বা একটা সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক মানুষগুলো।

যে লোক দু'জন হ্যান্ডেল জাতীয় মেশিন ঘোরাচ্ছিলো তারা তখনও সেই গুহায় হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে। তবে বনহুর এখন তাদের দেখতে পাচ্ছে না। তবু সে আন্দাজে বুঝে নিলো বা বুঝতে পারলো।

বনহুর বেশ ক্ষুধা অনুভব করছে।

যান্ত্রিক মানুষগুলোর পেটেতো ক্ষুধা নেই তাই তারা নিঃশব্দে এগুচ্ছে।

হঠাৎ থেমে গেলো যান্ত্রিক মানুষগুলো।

এবার বনহুর দেখতে লাগলো, যান্ত্রিক মানুষগুলো যেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেখানে প্রশস্ত জায়গা এবং চারপাশে নানা রকম যান্ত্রিক কলকারখানা।

বনহুর ভীষণ অবাক হলো।

একটা জনপ্রাণহীন দ্বীপের পর্বতমালার অতল গহ্বরে এমন সব মেশিনারী কলকারখানা রয়েছে সত্যি ভাবতে অবাক লাগে। বনহুর তার যান্ত্রিক বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মেশিনগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক ব্যক্তি তার দেহে তেল কালি মাখা পোশাক। পাশের টেবিলে কিছু পাউরুটি আর মাখনও এক সোরাহি পানি। লোকটা বোধ হয় খাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো কিন্তু ঐ মুহূর্তে খাওয়া আর হলো না! যান্ত্রিক মানুষগুলোর আগমনে লোকটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রথম যান্ত্রিক মানুষটার পাশে এগিয়ে এলো এবং তার পিঠের সুইচে চাপ দিতেই যান্ত্রিক মানুষটা বেশ হাঁটতে শুরু করলো এবং এগিয়ে গেলো একটা মেশিনের পাশে।

তেলমাখা পোশাক পরিহিত লোকটা মাথার ক্যাপটা খুলে রেখে একটা রবারের পাইপ পরিয়ে দিলো যান্ত্রিক এক নম্বর মানুষটার পিঠের সঙ্গে।

তারপর সুইচ টিপলো।

সাঁ সাঁ আওয়াজ হলো, মনে হলো কিছুটা গ্যাস ঐ যান্ত্রিক মানুষটার দেহে প্রবেশ করলো।

বনহুরের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো, যান্ত্রিক মানুষগুলো তাহলে গ্যাসের দ্বারা চালিত হয়। গ্যাস হলো যান্ত্রিক মানুষগুলোর খাদ্য।

লোকটা একটার পর একটা যান্ত্রিক মানুষকে টেনে নিয়ে গ্যাস ভক্ষণ করাচ্ছিলো। পাঁচ নম্বরে গিয়ে তার পালা।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে নিলো।

যেমনি লোকটা তার পাশে এসে দাঁড়ালো অমনি সে দু'হাতে টিপে ধরলো লোকটার গলা। খুব চেপে ধরলো যেন কোনো আওয়াজ তার মুখ দিয়ে না বের হয়। যান্ত্রিক মানুষের লৌহবর্মপরা হাতের মুঠির কঠিন চাপ লোকটা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো।

বনহুর ওকে নিক্ষেপ করলো মেঝেতে।

তাড়াতাড়ি করে বনহুর এবার ওপাশে টেবিল আকার পাথরটার উপরে রক্ষিত খাদ্যগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো সে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাখন আর পাউরুটি শেষ করে সোরাহি ধরনের পানির পাত্রটা তুলে নিলো, তারপর ঢক-ঢক করে পানি পান করতে লাগলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে এক তরুণী সেই গুহায় প্রবেশ করে যান্ত্রিক মানুষটাকে আশ্চর্যজনকভাবে পানির পাত্র হতে পানি পান করতে দেখে চিৎকার করে উঠলো।

বনহুর বুঝতে পারলো তরুণী তাকে সত্যিই যান্ত্রিক মানুষ মনে করে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বনহুর ইচ্ছা করেই মাটির পানির পাত্রটি হাত থেকে ফেলে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে খান খান হয়ে ভেঙে গেলো পানির পাত্রটা।

তরুণী চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো আর এই পোশাকে আত্মগোপন চলবে। না। কারণ এক্ষুণি অন্য কেউ এসে তাকে খুঁজে বের করবে।

বনহুর দ্রুতহস্তে পোশাকখানা খুলে পরিয়ে দিলো। সেই সংজ্ঞাহীন লোকটার দেহে। খুব কষ্ট হলো যদিও তবু বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করলো।

সংজ্ঞাহীন লোকটার দেহে যান্ত্রিক লোকগুলোর পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়ে নিজে আড়ালে আত্মগোপন করে ফেললো। ততক্ষণে তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষ এবং সেই তরুণী যে বনহুরকে সোরাহির পানি পান করতে দেখে ভীতভাবে চিৎকার করে পালিয়ে গিয়েছিলো, মনে করেছিলো যান্ত্রিক মানুষটা পানি পান করছে।

তরুণী এসেই আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে স্থানে বনহুর দাঁড়িয়ে পাউরুটি আর পানি পান করেছিলো। কিন্তু সেখানে কাউকে না দেখে যান্ত্রিকমানুষগুলোর দিকে এগিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়লো নিচে মেঝেতে পড়ে আছে একটা যান্ত্রিক মানুষ।

তিনজন লোক এবং তরুণী যান্ত্রিক মানুষ মনে করে যেমন মেঝেতে পড়া লোকটাকে তুলে দাঁড় করাতে গেলো অমনি তারা বুঝতে পারলো সেটা সত্যি যান্ত্রিক মানুষ নয় আসলে তাদেরই লোক।

লোকটা সংজ্ঞাহীন, তাহলে খেলো কি করে?

তরুণী বললো—আমি নিজে তাকে সোরাহিসহ পানি পান করতে দেখেছি।

বনহুর যদিও তাদের কথা বুঝতে পারছিলো না তবু আন্দাজে বুঝে নিলো সব কিছু। তরুণী তার সঙ্গীদের বলছে এই ব্যক্তিকে সে নিজের চোখে খেতে দেখেছে তারপর সে কেমন করে সংজ্ঞা হারালো তা জানে না।

তরুণীর সঙ্গী তিনজন তার কথা মেনে নিলো এবং সংজ্ঞাহীন লোকটার দেহ থেকে লৌহবর্ম খুলে দিয়ে তাকে বয়ে নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর এবার ফলো করলো লোকগুলোকে।

সুড়ঙ্গপথ ধরে ওরা চলেছে।

বনহুর অতি সাবধানে এগুচ্ছে। তাকে যেন দেখে না ফেলে এদিকে রয়েছে তার সতর্কদৃষ্টি।

একি, ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে সুড়ঙ্গপথটা।

সংজ্ঞাহীন লোকটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে ওরা।

দু'পাশে পাথুরে দেয়াল।

মাথার উপরেও পাথর, একটুও নজরে পড়ছে না কিছু। শুধু জমাট অন্ধকার মনে হচ্ছে।

এবার ভীষণ একটা গর্জন কানে আসছে বনহুরের। ঠিক সমুদ্রের গর্জন বলে মনে হচ্ছে। তবে কি এই সুড়ঙ্গপথ সমুদ্রের তলদেশে এসে পড়েছে? কি ভয়ংকর মহাচক্র বনহুর ভাবছে আর এগুচ্ছে।

ওর তিনজন এবং তরুণী সোজা এগুচ্ছে দ্রুতগতিতে।

সুড়ঙ্গপথ ঝাপসা অন্ধকার হলেও ওদের পথ চলতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

এবার আলোকরশ্মি ভরা একটা প্রশস্ত কক্ষ।

ঠিক পিঁপে মানুষটার মত একজন বসে আছে তার পাশে নানা ধরনের মেশিন এবং কলকজা রয়েছে তার সামনে। পিঁপে মানুষটার চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে যেন।

বনহুর সেই প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো না। সে আত্মগোপন করে এতদূর এসেছে কিন্তু আর এগুনো তার পক্ষে তখনকার জন্য মোটেই উচিত নয়।

একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে সব লক্ষ্য করে চললো।

তরুণী ও তার সঙ্গীত্রয় সেই মেশিনযুক্ত অদ্ভুত প্রশস্ত কক্ষটার মধ্যে প্রবেশ করতেই পিঁপে মানুষটা কর্কশ কণ্ঠে ইংরেজিতে বললো—ওর অবস্থা এ রকম কেন?

তরুণী ইংরেজিতে জবাব দিলো।

বনহুর বুঝতে পারলো পিঁপে মানুষটা আসলে জীব নয় সে মানুষ কিন্তু বনহুরের মনে পড়লো সর্পরাজের সঙ্গে পিঁপেরাজের যুদ্ধের কথা। তারপর মনে পড়লো সেই ভীষণ বালুকারাশির মধ্যে অদ্ভুতভাবে পিঁপে জীবগুলোর ডিম থেকে বাচ্চার উদ্ভব। সব দৃশ্যগুলো ভাসতে লাগলো বনহুরের চোখের সামনে।

কিন্তু আশ্চর্য, পিঁপে জীবগুলোতো মানুষ নয়, সে কথা বলবে কি করে। এতসুন্দর ভাষায় স্পষ্ট ইংরেজি কথা, না এ কখ্ খনও? হতে পারে না। তবে কি পিঁপে জীবগুলো কথা বলতে পারে। হয়তো শেখালে পারে কিন্তু বিশ্বাস হয় না বনহুরের।

পিঁপে জীবটার খোলসে নিশ্চয়ই পূর্বের মত কোনো যান্ত্রিক কলকব্জা আছে কিন্তু আশ্চর্য, যান্ত্রিক বস্তুর চোখগুলো অমন জীবন্ত হবে কি করে?

বনহুর ভাবছে।

তরুণী আর তার সঙ্গীত্রয় সংজ্ঞাহীন লোকটাকে নিয়ে চলে গেলো ওদিকে।

তখন বনহুর তাদেরকে ফলো না করে আড়ালে রয়ে গেলো এবং পিঁপে মানুষটার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো।

ওরা তিনজন চলে যেতেই পিঁপে মানুষটা নড়ে উঠলো তার তলদেশ থেকে বেরিয়ে এলো দু'খানা পা। একেবারে ভারী বুট পরা দু'খানা পা।

হাঁটছে পিঁপে মানুষটা।

এবার তার দেহ থেকে দু'খানা হাত বেরিয়ে এলো।

বনহুরের বিস্ময় বাড়ছে।

সে আরও ভালভাবে লক্ষ্য করছে।

পিঁপে জীবগুলো তো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। তাদের পা এবং হাত কিছুই নেই কিন্তু এ আবার কেমন ধরনের জীব। পা-হাত সব আছে, পিঁপে জীবটা আসন থেকে নেমে সোজা একটা মেশিনের দিকে এগিয়ে গেলো।

বনহুর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সব দেখছে।

পিঁপে লোকটার মাথাও বেরিয়ে পড়লো কাঁধের ভেতর থেকে।

আশ্চর্য বটে।

কিন্তু মাথা আর মুখ কভারে ঢাকা।

বনহুর পিঁপে জীবটার খোলসে একজনকে আত্মগোপন করে থাকতে দেখে অবাক হলো। লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই ব্যক্তি কে?

সুইচ টিপলো পিঁপে মানুষটা।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে বড় একটা টেলিভিশন পর্দা ভেসে উঠলো, সেই টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠলো আশ্চর্য সব দৃশ্য।

দেখা যাচ্ছে তিনজন লোক এবং সেই তরুণী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেই লোককে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা টেবিলে সংজ্ঞাহীন লোকটাকে শুইয়ে দিলো ওরা। তারপর লোকটার শরীর থেকে আবরণ বা তার তেলকালি মাখা পোশাক খুলে ফেললো।

এমন সময় একজন লোক হাজির হলো। তার মুখে মাস্ক বাঁধা, হাতে এক ধরনের পাইপ আছে বলে মনে হচ্ছে।

পিঁপে মানুষটা সুইচ অন্ করে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, তার মুখমন্ডল দেখা যাচ্ছিলো না, দেখা গেলে তার মুখোভাবে অনেক কিছু বুঝে নিতো বনহুর।

লোক তিনজন সংজ্ঞাহীন লোকটার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। নাকের মধ্যে এক ধরনের পাইপ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার নিশ্বাসকে সজীব করার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা চালাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এলো লোকটার।

টেবিলে উঠে বসলো এবং নিজের মাথায় বারবার ঝাকুনি দিচ্ছিলো।

সব লক্ষ্য করছে সেই পিঁপে মানুষটা।

বনহুর বুঝতে পারে পিঁপে মানুষটার দেহের আবরণ সত্যিকারের আবরণ নয়। আসলে পিঁপের মধ্যে আছে একটা আসল মানবদেহ এবং সেই ব্যক্তিই এদের দলপতি।

লোকটা পিঁপে জীবের অন্তরালে নিজকে আড়াল করে রেখে কাজ করছে।

পিঁপে মানুষটা তার সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দায় তাকিয়ে কিছু উচ্চারণ করলো। তখন দেখা গেলো টেবিলে বসা সেই সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া ব্যক্তি কিছু উচ্চারণ করছে।

পাশে দাঁড়িয়ে তরুণী তা নোট করে নিচ্ছে।

পিঁপে মানুষটা তার দেহটা নিয়ে দুলে উঠলো, তারপর সুইচ অফ্ করে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা এবং মাথা গুটিয়ে ফেললো পিঁপে দেহটার মধ্যে।

বনহুর সরে গেলো সেখান থেকে।

পেছনে লক্ষ্য করতেই একটা সিঁড়ি তার দৃষ্টিপথে পড়ে গেলো। অত্যন্ত গোপনীয় পথ বলে মনে হচ্ছে বনহুরের কাছে। বনহুর সেই সিঁড়িপথ ধরে উপরে উঠতে লাগলো।

সমুদ্রের গর্জন আরও স্পষ্ট কানে আসছে।

কিছুটা উঠার পর দু'পাশে রবারযুক্ত আবরণ এবং একটা কৌশলে নির্মিত চোঙ্গা। সিঁড়িখানা সেই চোঙ্গাপথে অদৃশ্য হয়েছে।

বনহুর কোনো দ্বিধা না করে সেই চোঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করলো। অমনি চোঙ্গাখানা সাঁ সাঁ করে উপরে উঠতে লাগলো।

বনহুর ঝুলন্ত সিঁড়িখানা আঁকড়ে ধরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিঁড়িখানা উপরে উঠে যাচ্ছে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছে বনহুর। চারিদিকে অন্ধকার।

মাত্র কয়েক মিনিট।

সিঁড়িখানা তাকে একেবারে এমন জায়গায় এনে পৌঁছে দিলো সেটা সেই ডুবুজাহাজ।

বনহুর দেখলো একটা ক্যাবিনের মধ্যে তাকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ক্যাবিনটার কোনো দরজা-জানালা নজরে পড়ছে না, শুধু চারপাশে দেয়াল

এবং দেয়ালে নানা ধরনের বাল্ব আছে। বনহুর মেঝেতে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে একটা লাল বাল্ব জ্বলতে আর নিভতে লাগলো।

বনহুর কিছুটা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখছে, ব্যাপারখানা কি! ঠিক এমন সময় পূর্বের সেই ভারী গলার আওয়াজ। সম্পূর্ণ সাংকেতিক শব্দ।

একি, মেঝেটা তাকে নিয়ে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে।

একেবারে জাহাজের স্বাভাবিক ক্যাবিন।

লাইট জ্বলছে।

সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

জাহাজখানা সমুদ্রেগর্ভে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যে ক্যাবিনটায় বনহুর এসে দাঁড়ালো তার চারপাশে কয়েকটা কাঁচের আবরণ দেওয়া জানালা। বনহুর তাকালো কাঁচের আবরণ দিয়ে বাইরে। সমুদ্রের তলদেশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের বিস্ময়কর উদ্ভিদ এবং সামুদ্রিক জলজীব। বিরাট আকার হাঙ্গর সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, নানা ধরনের মাছ এবং কচ্ছপ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ সব দেখবার সময় নেই বনহুরের।

বনহুর ক্যাবিনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলো।

একনজর দেখলো অনেকগুলো প্যাকেট থরে থরে সাজানো আছে। প্যাকেটগুলোতে কোনো মূল্যবান সামগ্রী আছে তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর প্যাকেটগুলো দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো এই প্যাকেটগুলোই প্লেন থেকে নামানো হয়েছিলো।

বনহুর প্যাকেটগুলোর দিকে এগিয়ে যাবে ঠিক ঐ দন্ডে একটা আর্তনাদ শুনতে পেলো। মনে হলো ঐ ক্যাবিনটার ঠিক পাশেই কোন ক্যাবিনে এই আর্তনাদ হলো।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

প্যাকেটগুলো আর দেখা হলো না।

পাশে একটা দরজা কড় কড় করে খুলে গেলো।

বনহুর দ্রুত সেই দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। সে দেখলো একজন লোক মুখে মুখোশ হাতে বিস্ময়কর অস্ত্র নিয়ে সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

ক্যাবিনে প্রবেশ করেই শিষ দিলো সে, অমনি তিন জন লোক তাদের মুখেও মুখোশ প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে।

প্রথম ব্যক্তি ইংগিত করলো তার সঙ্গী তিনজনকে প্যাকেটগুলো কাঁধে তুলে নেবার জন্য।

তিন ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির নির্দেশমত কাজ করলো।

ওরা তিনজন কাঁধে তুলে নিতেই প্রথম ব্যক্তি সম্মুখের একটা হ্যান্ডেল জাতীয় মেশিন ঘোরাতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলাভ আলো জ্বলে উঠলো ক্যাবিনটার মধ্যে, দেয়ালে ভেসে উঠলো টেলিভিশন পর্দা। আশ্চর্য, ঠিক নিচের ক্যাবিনের মতই টেলিভিশন পর্দাটা।

বনহুর দেখছে পরিস্কার আকাশ।

মাঝে মাঝে খন্ড খন্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্রথম ব্যক্তি তখনও হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চলেছে। কয়েক মিনিট টেলিভিশন পর্দায় দেখা গেলো একটা প্লেন উড়ে আসছে।

প্রথম ব্যক্তি নিজের মুখের আবরণ খুলে ফেললো।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো প্রথম ব্যক্তি অন্য কেউ নয় সেই তরুণী। এমনভাবে সে পোশাক পরেছে যে, তাকে পুরুষ ছাড়া কিছু মনে হবে না।

অপর তিন জন যদিও কাঁধে প্যাকেটগুলো বোঝা বেঁধে তুলে নিয়েছে তবু তারা মুখের আবরণ এক একজন খুলে ফেললো।

বনহুর দেখলো তারা ঐ তরুণীর সঙ্গী তিনজন।

সবাই পুনরায় নিজ নিজ মুখের আবরণ ঢেকে ফেললো।

আশ্চর্য ধরনের দেয়াল টেলিভিশনের পর্দায় প্লেনখানা স্পষ্ট হতে আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠলো ওরা চারজন।

ওদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করে মনে হলো কোনো কু'কর্ম সাধন শেষে পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। এই ক্যাবিনে অন্য কেউ আত্মগোপন করে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে এ কথা ভাবতেও পারেনি তারা।

প্লেনখানা প্রায় এসে গেছে।

পুরুষ বেশধারী তরুণীটি হ্যান্ডেল জাতীয় মেশিনটা অপরদিকে ঘুরিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে সেই বিস্ময়কর টেলিভিশন পর্দা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো প্লেনখানা তাদের জাহাজের ঠিক উপরে এসে গেছে। তরুণী আর একটা হ্যান্ডেল ঘোরাতে শুরু করলো।

এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জাহাজখানা ভেসে উঠছে উপরের দিকে। শব্দ হচ্ছে ঝক্ ঝক্ ঝক্—

বনহুর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করছে সবকিছু।

কিছুক্ষণ বনহুর সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওরা কিছু পরামর্শ করে নিলো নিজেদের মধ্যে।

বনহুরের বুঝতে বাকি রইলো না ওরা তাদের মালিক বা দলপতিকে হত্যা করে পালিয়ে যাচ্ছে অথবা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

তরুণী এবং ওরা তিনজন প্যাকেটগুলো গুছিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এবার বেরিয়ে গেলো ওরা।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাদের পেছনেই বেরিয়ে এলো, সবার পেছনে যে আসছিলো বনহুর আচমকা তাকে টেনে নিলো আড়ালে এবং সে টু শব্দ করবার পূর্বেই মুখে রুমাল গুঁজে দিলো ভালভাবে।

এবার বনহুর লোকটার পোশাক খুলে নিলো এবং নিজে পরে নিলো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। তারপর ওর কাঁধের প্যাকেটগুলো নিজের কাঁধে তুলে নেবার পূর্বে একটা প্যাকেট খুলে দেখে নিলো। দেখলো প্যাকেটগুলোর মধ্যে রয়েছে অতিমূল্যবান পাথরযুক্ত বলয়। মাত্র এক সেকেন্ড দেখে নিলো তারপর বনহুর মুখোশ দিয়ে নিজের মুখমন্ডল আচ্ছাদন করে নিলো এবং কাঁধে প্যাকেটগুলো তুলে নিয়ে ওদের দলে এসে যোগ দিলো।

বনহুর হঠাৎ হোচট খেলো মেঝেতে পড়া একটা বস্তুর সঙ্গে। দেখলো বস্তুটি অন্য কিছু নয় সেই পিঁপে মানুষটি। যার হাত, পা, মুখ এবং মাথা দেহের মধ্য হতে বেরিয়ে এসেছিলো এবং হাত দিয়ে হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছিলো অতি সতর্কতার সঙ্গে।

বনহুর বুঝতে পারলো এই পিঁপে মানুষটাই ছিলো তাদের দলপতি। আসলে সে সত্যিকারের পিঁপে মানুষ নয়, সে সাধারণ মানুষ কিন্তু পিঁপে জাতীয় খোলসের মধ্যে নিজকে গোপন রাখতো। নিজদের লোকের কাছেও নিজকে প্রকাশ করেনি।

একদিন নিজ দলের মানুষগুলোই হলো তার শত্রু। যারা তার দলে যোগ দিয়ে কাজ করতো তারা দেখলো কোটি কোটি টাকার সামগ্রী তারা বাইরে পাচার করে দিচ্ছে তার পরিবর্তে আসছে প্রচুর অর্থ কিন্তু সে অর্থে তাদের কোনো স্বত্ব নেই, তারা সে অর্থে কোনোদিন ভাগ বসাতে পারবে না। তাই দলের লোক দলপতিকে হত্যা করে বলয়-এর প্যাকেটগুলো নিয়ে বিমানযোগে পালানোর মতলব করেছে।

বনহুর দলপতির মৃতদেহটার দিকে একবার দেখে নিয়ে এসে হাজির হলো সঙ্গীদের সারিতে।

ডুবুজাহাজখানা সম্পূর্ণ ভেসে উঠেছে।

আস্তে আস্তে ঢাকনাটা খুলে যাচ্ছে।

সঙ্গীরা বনহুরকে মোটেই সন্দেহ করতে পারে না, কারণ তার দেহে যে পোশাক ছিলো তা তাদেরই তিনজনের একজনের। কাজেই বনহুর কতকটা নিশ্চিন্তভাবেই কাজ করে যাচ্ছে।

প্লেনখানা নেমে এলো জাহাজটার উপরে, সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো। তিনজন সহ তরুণী দ্রুত প্যাকেটগুলো বহন করে প্লেনে উঠে পড়লো।

ক্ষিপ্রগতিতে কাজ হচ্ছে।

ওরা চারজন প্লেনে চেপে বসতেই প্লেনখানা আকাশে উড়ে উঠলো।

আকাশে প্লেনখানা ভেসে উঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হলো, ডুবুজাহাজখানা ভাসমান অবস্থায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে পর্বতমালাগুলো ধসে পড়ছে চারপাশে।

বনহুর বুঝতে পারলো তরুণী শুধু সম্পদ নিয়েই পালাচ্ছে না, সে সমুলে সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে সরে পড়ছে।

বনহুর প্লেন থেকেই নিচের এ দৃশ্য দেখলো। নিজের অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—মংস্কো দ্বীপের মহাচক্রের পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু এই চক্রীদলকে এমন সহজভাবে পালিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

বিমানখানা যখন আকাশপথে সমুদ্র অতিক্রম করছিলো তখন বনহুর নিশ্চুপ থাকতে পারলো না। সে দ্রুত আসন ত্যাগ করলো এবং বিমান চালকের বুক লক্ষ্য করে তার ক্ষুদে পিস্তল উঁচু করে ধরলো।

বিমান চালক হতভম্ব হয়ে পড়লো।

তরুণী এবং তার অপর সঙ্গী দু'জন মনে করলো তাদের একজন সব ছিনিয়ে নেবার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে।

তরুণী ও অপর দু'জন হকচকিয়ে গেলো।

আশ্চর্য হলো একজন সঙ্গী তাদের বিদ্রোহী হয়েছে বলে।

বনহুরকে ওরা আক্রমণ করলো পেছন থেকে।

বিমানে শুরু হলো মল্লযুদ্ধ।

বনহুর তার ক্ষুদে পিস্তলখানা ব্যবহার করলো। প্রথম গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো একজন চক্রীর পাঁজরে। সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে পড়ে গেলো সে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো বিমানের মেঝেটা।

বনহুরকে এবার আক্রমণ করলো দ্বিতীয় জন।

বনহুরের পিস্তলের একটা গুলী তাকেও পরপারে পাঠিয়ে দিলো।

এবার তরুণী।

সে তার কঠিন অস্ত্র নিয়ে বনহুরকে আক্রমণ করলো।

বনহুর জানে তরুণীর হাতের অস্ত্রখানা মারাত্মক। তাই সে কৌশলে তরুণীকে পেছন থেকে ধরে ফেললো।

বনহুরের শক্তির কাছে তরুণীর দেহবল ক্ষীণ।

কাজেই সে কাবু হয়ে পড়লো মুহূর্তে।

আশ্চর্য হলো তরুণী, তার দলের মধ্যে এমন শক্তিশালী ব্যক্তিও ছিলো যে তাকে কাবু করতে পারে। তরুণী বললো—মাংকু, তুমি আমাকেও পরাজিত করলে?

বনহুর বুঝে নিলো সে যার পোশাক পরে নিয়েছে তার নাম মাংকু।

বনহুর নিজের ক্ষুদে পিস্তলখানা পূর্বেই পকেটে রেখে দিয়েছিলো। এবার সে তরুণীকে মুক্তি দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

তরুণীর মুখের আবরণ খুলে ফেললো বনহুর একটানে, তারপর বললো—খবরদার, যদি কোনো রকম গোলযোগ সৃষ্টি করেছো তাহলে আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

বনহুরের গলা তরুণী নতুন শুনলো।

অবশ্য কথাবার্তা ইংরাজিতে হচ্ছিলো।

এই আবরণের নিচে যে তাদের লোক নয় অপর কেউ রয়েছে তা বুঝতে পারলো তরুণী, সে বলে উঠলো—কে তুমি!

বনহুর বললো—তোমাদের বন্ধু।

তরুণী আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং চিৎকার করে বললো—পাইলট, তুমি আমাদের ঘাটিতে জানিয়ে দাও আমরা বিপদগ্রস্ত এবং আমাদের বিমানে শত্রু আসছে। তারা যেন প্রস্তুত থাকে...

পাইলট তরুণীর কথামত যেমনি ওয়্যারলেসে তার কথাগুলো জানাতে গেলো অমনি উঁচু করে ধরলো—খবরদার, শব্দ যদি উচ্চারণ করো বা তোমাদের ঘাটিতে জানাও তাহলে এক্ষুণি এই ভয়ংকর পিস্তলখানার একটা গুলী তোমার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেবো।

পাইলট নিশ্চুপ রইলো।

মৃত্যুভয় কার না আছে।

তরুণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। যেন দাঁতে দাঁত পিষে বললো—শত্রু, তোমাকেও আমি দেখে নিচ্ছি...কথাটা বলে সে বিমানের মেঝেতে থেকে হাত থেকে তার খসে পড়া মারাত্মক অস্ত্রখানা তুলে নিতে গেলো।

বনহুর টের পেয়ে দ্রুত পা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো বিমানের পেছন অংশে।

তরুণী হতবুদ্ধি হলো না। ভীষণ চালাক সে, বিমানের মেঝের এক অংশে পা দিয়ে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বিমানের তলদেশ ফাঁক হয়ে গেলো।

বনহুর নিচে পড়ে গেলো।

বনহুর বিমানের তলদেশ দিয়ে শূন্যে পতিত হলো।

নিচে গভীর সমুদ্রতরঙ্গ।

বনহুর পড়ে গেলো সমুদ্রগর্ভে।

❑

জাভেদ কান্দাই আস্তানায় এসে পড়লো।

অশ্বপদশব্দ শোনামাত্র রহমান কায়েস এবং আরও কয়েকজন অনুচর তাকে ঘিরে ধরলো।

অশ্বলাগাম ধরলো রহমান তার ডান হাত দিয়ে।

নেমে দাঁড়ালো জাভেদ।

কুর্ণিশ জানালো অন্যান্য অনুচর।

জাভেদ তার পিতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। সৌন্দর্যে শক্তিতে এবং বুদ্ধিবলে। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

জাভেদ অশ্ব থেকে নেমে আস্তানায় ভিতরে প্রবেশ করলো।

কেউ তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলো না।

রহমান অপর এক অনুচরকে অশ্ব আস্তাবলে বেঁধে রাখার জন্য বললো।

রহমানের আদেশ পালন করলো অনুচরটা।

অন্যান্য অনুচর একটু ভীত আতঙ্কিত হলো। কারণ জাভেদকে আজ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা হিংস্র ভাব।

এমন কি রহমান নিজেও সাহসী হলো না তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার।

জাভেদ আস্তানায় প্রবেশ করলো।

তাকে অনুসরণ করলো রহমান এবং কায়েস।

জাভেদের আগমন সংবাদ পেয়ে ছুটে এলো নূরী। জাভেদ আস্তানায় এসেছে এটা তার বড় খুশির সংবাদ। হাজার হলেও পুত্র-দরদ জননীর কাছে সীমাহীন।

জাভেদ সোজা দরবারকক্ষে গিয়ে হাজির হলো।

ছুটে এলো অন্যান্য অনুচর।

নূরীও এলো।

পুত্রকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখে বিচলিত হলো নূরী। পুত্রের পাশে এসে বললো—জাভেদ, কি সংবাদ?

জাভেদ হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেলে বললো—জাম্বুরীরা আশা আম্মুকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে।

মুহূর্তে নূরীর মুখমন্ডল রাঙা হয়ে উঠলো, সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো—জাম্বুরীরা আশাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে, বলিস কি জাভেদ?

হাঁ, সত্যি যা তাই বলছি। বললো জাভেদ।

নূরী আর জাভেদের কথাগুলো রহমানের কানে যেতেই তার মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো।

রহমান জানে জাভেদ আশাকে কতখানি শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তাছাড়া আশা বহুবার নানাভাবে সর্দারের জীবন রক্ষা করেছে। আজ সেই আশা বিপদগ্রস্ত...

রহমানও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

জাভেদ অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বললো—তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও, জাম্বুরীদের সঙ্গে লড়াই হবে।

নূরী বললো—জাভেদ, তুমি জানোনা জাম্বুরীরা কত ভয়ংকর।

জানি কিন্তু জেনে রেখো আম্মু জাম্বুরীদের কাবু করে আমি আশা আম্মুকে উদ্ধার করবোই।

বেশ, আমি নিজেও তোমাকে সহায়তা করবো। বললো নূরী।

জাভেদ খুশি হলো।

নূরী অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো—যাও তোমরা এক্ষুণি তৈরি হয়ে নাও নিজ-নিজ অস্ত্র এবং অশ্ব নিয়ে।

নূরীর নির্দেশ পাওয়ামাত্র অনুচরগণ হর্ষধ্বনি করে বললো— আমরা প্রস্তুত হতে যাচ্ছি।

সবাই বেরিয়ে গেলো।

নূরী জাভেদ সহ ফিরে এলো আস্তানার অভ্যন্তরে।

জাভেদ পায়চারী করছে।

এমন সময় ফুল্লরা দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়ালো। জাভেদকে দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে বললো—তুমি এসেছো জাভেদ—আঃ আমি যা খুশি হয়েছি।

জাভেদ ওর কথায় কান না দিয়ে বললো—না জানি আশা আম্মুকে ওরা কতদূর পাকড়াও করে নিয়ে গেছে?...না জানি এখন সে কেমন আছে...

ফুল্লরা রাগতভাবে বললো জাভেদ—তুমি কতদিন পর এলে আর আমার সঙ্গে কথাই বলছো না? যাও আমিও তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

জাভেদ বললো—তাতে আমার বয়েই যাবে।

কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ছি না।

কেন?

তুমি আমাদের এখানে থাকবে। জানো জাভেদ নূরী আম্মু তোমার জন্য কত দুঃখ করে।

জানি তবু কোনো উপায় নেই। তারপর আপন মনেই বলে উঠে জাভেদ—আশা আম্মু আমাকে তোমাদের চেয়ে অনেক ভালবাসে।

ফুল্লরা বলে উঠে—নূরী আম্মুর চেয়েও আশা আম্মু তোমাকে—

হাঁ।

না, তুমি ভুল করছো জাভেদ।

আমি অবুঝ শিশু নই ফুল্লরা। যাও এখন তুমি বিরক্ত করো না।

বিরক্ত আমি করবোই।

কারণ?

কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে জাভেদ।

ফুল্লরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে। শুধু আজ নয়, এমনি আরও অনেক দিন ফুল্লরা জাভেদের কাছে অবহেলা পেয়েছে। নানা রকম কথা বলে তাকে ব্যথা দিয়েছে জাভেদ।

আজও জাভেদ ফুল্লরাকে তেমনিভাবে বিদায় করার চেষ্টা করলো কিন্তু ফুল্লরা চলে গেলো না, বললো—জাভেদ, তুমি দিন দিন বড় নিষ্ঠুর হচ্ছো।

নিষ্ঠুর—কে বললো?

আমি বলছি।

তুমি তো জানোনা আমি কত নিষ্ঠুর। যদি জানতে তবে এমনভাবে আমাকে বিরক্ত করতে আসতে না।

জাভেদ।

আমি তোমাকে বারণ করছি বিরক্ত করোনা।

ফুল্লরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে তারপর ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো।

এমন সময় সেখানে প্রবেশ করে নূরী, তার দেহে শিকারী ড্রেস, পিঠে রাইফেল বাঁধা।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে নূরী।

গুহায় প্রবেশ করতেই ফুল্লরাকে আটকে ফেলে। তার চোখে অশ্রু দেখে বলে উঠে নূরী—কি হলো, ফুল্লরা অমন করে চলে যাচ্ছ কেন?

জাভেদ কোনো কথা না বলে বললো—আম্মু তুমি প্রস্তুত? চলো এবার রওনা দেওয়া যাক।

বললো নূরী—না, আগে জবাব দাও ফুল্লরার সঙ্গে তোমার কি হয়েছে? ওর চোখে পানি কেন?

বললো জাভেদ— আমি কেমন করে বলবো?

ওর চোখে পানি কেন তুই জানিস না জাভেদ?

না।

মিথ্যে কথা।

আম্মু, এখন এত কথা বলার সময় নেই, আমাকে যেতে দাও?

আগে বলতে হবে।

আম্মু।

তোর বাপু আমাকে এমনি করে কাঁদিয়েছে, আজও সে আমাকে কাঁদাচ্ছে আর তুই—

আম্মু তুমি কি বলছো আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।

তোরা পুরুষ মানুষ মেয়েদের ব্যথা বুঝতে চাইবি না জানি। শোন্ জাভেদ, শিশুকাল থেকে ফুল্লরা আর তুই খেলার সাথী।

জানি আমি।

ওকে তুই অবহেলা করতে পারবি না।

কে বললো ওকে আমি অবহেলা করি। তবে ও আমাকে যখন তখন বিরক্ত করতে পারবে না।

ফুল্লরা আরও উচ্ছ্বসিতভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলো না।

নূরী বললো—জাভেদ, ফুল্লরাকে তুই অবহেলা করতে পারবি না। ও যাতে খুশি হয় তাই তোকে করতে হবে।

মায়ের কথা শুনে আর একবার হো হো করে হেসে উঠলো জাভেদ, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে আস্তানার বাইরে।

আস্তানার বাইরে সবাই অশ্ব আর অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো।

জাভেদ আর নূরী এসে দাঁড়াতেই অনুচরগণ নিজ নিজ অশ্বের লাগাম চেপে ধরলো।

রহমানও তাদের সঙ্গে চলেছে।

রহমান অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতেই জাভেদ এবং নূরী নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

অশ্বগুলো একসঙ্গে এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

❑

বনহুর সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়ে পুনরায় ভেসে উঠলো। প্রচন্ড প্রচন্ড ঢেউগুলোর বুকে কখনও তলিয়ে যাচ্ছে আবার কখনও ভেসে উঠছে। প্রাণপণে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে বনহুর।

কিন্তু ভয়ংকর তরঙ্গের বুকে কতক্ষণ সাঁতার কাটা যায়।

নাকেমুখে নোনা পানি প্রবেশ করছে বনহুরের।

অনেক কষ্টে এতক্ষণ নিজকে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছে বনহুর। কিন্তু কতক্ষণ, একসময় তলিয়ে গেলো সে।

যখন সংজ্ঞা ফিরলো তখন দেখলো একটি ষ্টিমারের বেডে শুয়ে আছে সে। তার পাশে একজন পুরুষ, তার দেহে নাবিকের পোশাক।

বনহুর চোখ মেলে তাকাতে দেখে লোকটা অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো একজন বৃদ্ধ ও এক তরুণ। তাদের শরীরেও নাবিকের পোশাক।

বনহুর চোখ মেলে তাকাতে দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হলো।

বনহুর ভাবলো সে মরেনি, জীবিত আছে।

মনে মনে খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো।

বৃদ্ধ ঝুকে পড়ে অদ্ভুত ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করলো বনহুরকে।

বনহুর বুঝতে পারলো না একবর্ণ তবু সে মাথা দুলিয়ে বললো—ভাল আছি।

বৃদ্ধের সঙ্গী তরুণটা করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো। বনহুর কণ্ঠ শোনামাত্র বুঝতে পারলো তরুণটা পুরুষ নয়—সে তরুণী।

বনহুর বড় ক্লান্তি বোধ করছিলো তাই চোখ বন্ধ করলো।

বৃদ্ধ তরুণটাকে কিছু বললো।

তরুণী বেরিয়ে গেলো এবং একটু পরে ফিরে এলো, তার হাতে একটা বাটিতে কিছু তরল পদার্থ।

বৃদ্ধ বাটিটা হাতে নিয়ে বনহুরকে তুলে ধরে তাকে খাবার জন্য অনুরোধ জানালো।

বনহুর বড় পিপাসা অনুভব করছিলো তাই কোনো রকম আপত্তি না করে বাটির তরল পদার্থ ঢক্ ঢক্ করে পান করলো।

বড় সুস্বাদু মনে হলো ঐ মুহূর্তে তরল পদার্থগুলো। কোনো ফলের রস বলেই মনে হলো বনহুরের কাছে।

বনহুর এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করলো। অনেক কিছু প্রশ্ন তার মনে জমা হচ্ছে কিন্তু এরা যে ভাষায় কথা বলছে সে ভাষা মোটেই বনহুর বুঝতে পারছে না এবং সে যা প্রশ্ন করবে তাও তারা বুঝতে পারবে না, কাজেই সব

প্রশ্ন মনেই চেপে রাখলো বনহুর সে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবার পর আর কিছুই স্মরণ করতে পারছে না। এরা কারা? কেমন করেই বা তারা তাকে পেলো? কেনই বা তারা তাকে তাদের ষ্টিমারে তুলে নিলো। বনহুরের মনে হচ্ছে ষ্টিমারখানা তাদের দেশের মত স্বাভাবিক নয়। এটা একটা আশ্চর্য ধরনের যান বলা যায়।

বনহুর দু'চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ বসবার পর বেরিয়ে গেলো।

সে বেরিয়ে যাবার পূর্বে তরুণীটিকে কিছু বলে গেলো।

অপর ব্যক্তি যে প্রথম ছিলো সেও হয়তো তার কাজে বেরিয়ে গেলো।

চোখ মেলে তাকালো বনহুর, দেখলো তরুণী তার শিয়রে বসে আছে। যদিও তার দেহে পুরুষের পোশাক, মাথার চুল পুরুষদের মত ছোট করে ছাঁটা তবু তার চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা লাবণ্যময় ভাব।

বনহুর তাকালো ওর মুখের দিকে।

ভারী মিষ্টি ওর চেহারা।

ডাগর ডাগর দুটি চোখে মায়াভরা চাহনি। গায়ের রং বেশি ফর্সা নয়, শ্যামলা। বনহুরকে তাকাচ্ছে দেখে মিষ্টি হেসে সরল কণ্ঠে কিছু বললো।

বনহুর তার একটা শব্দও বুঝতে পারলো না। মাথা নাড়লো বনহুর, ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলো সে কিছু বুঝতে পারছে না।

তরুণীও আঁচ করলো লোকটা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছে না।

তরুণী ব্যথা অনুভব করলো।

আরও একটু সরে এলো বনহুরের পাশে। মাথায় হাত রাখলো।

বনহুরের কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলো।

বনহুর ওকে বাধা দিলো না।

বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো তরুণী।

❑

একদিন দুদিন তিন দিন।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো বনহুর।

ষ্টিমারখানা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, কতকটা কুমিরের মত আকার।

সামনে মুখটা কুমিরের হার মত।

পাশে রেলিং ঘেরা ডেক আছে।

বনহুর এখন ভাল আছে, খাবার পায় তাজা ফলের রস। যত্ন পায় প্রচুর কিন্তু সে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

তরুণী এ ষ্টিমারে কাজ করে, খালাসির কাজ। বৃদ্ধ তার বাবা, এটুকু অনুধাবন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো বনহুর।

তরুণী মাঝে মাঝে এসে পাশে বসে, কিছু বলতে চেষ্টা করে হয়তো বলে তুমি কে? তোমার দেশ কোথায়? তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি সমুদ্রগর্ভে গেলে কেমন করে? বনহুর তাদের ভাষা না বুঝলেও মনোভাব বুঝতে পারে। কিন্তু বুঝে কি হবে বোঝাতে সক্ষম হয় না।

ক্ষুধা পেলে পেট আর মুখ দেখিয়ে ইশারা করে বনহুর।

তরুণী এ ক'দিনে সব বুঝে নিয়েছে, কথা না বুঝলেও ইশারায় চলে সব কথা।

ক'দিনেই বনহুরকে তরুণী বন্ধুর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে।

নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো বনহুরের কেটে যাচ্ছিলো কোনো রকমে। তরুণীর নাম নিশো। বনহুরের নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তের সঙ্গী নিশো।

ওর সরল সহজ চালচলন বড় ভাল লাগে বনহুরের। যখন সে ডেকে এসে দাঁড়ায়, নিশো এসে দাঁড়ায় পাশে।

নীল আকাশে হাল্‌কা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসে নিশো।

ওর পাঞ্জাবীপরা দেহটা দুলে দুলে কেঁপে উঠে হাসির সঙ্গে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলোর মত।

বনহুরও হাসে, তাকিয়ে দেখে নেয় আকাশটার দিকে।

নিশো সমুদ্রের ঢেউগুলোর দিকে দেখিয়ে হাসে। কিছু বলতে চায় কিন্তু বলা হয় না। বাপু এসে দাঁড়ায় পাশে।

বনহুরের পিঠ চাপড়ে আদর করে বৃদ্ধ।

নিশো হাসে।

হাসি ছাড়া নিশোর আর কি আছে যা সে উপহার দেবে বনহুরকে।

জাহাজ নয় ষ্টিমার।

তিনজন চালক।

আর যাত্রী দু'জন বলা চলে। বৃদ্ধ আর তার কন্যা নিশো। বনহুর আসার পর তিনজন হয়েছে।

এরা কোথায় চলেছে?

কেন চলেছে?

কি এদের উদ্দেশ্য কিছু জানে না বনহুর। কাগজপত্র কিছু পেয়েছিলো কিন্তু সে ভাষা বনহুর বুঝতে পারেনি।

বনহুর তবু চেষ্টা করছিলো বোঝার।

বিফলকাম হয়েছে।

অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বনহুর প্রতীক্ষা করছে কবে তীরে পৌঁছবে তারা।

এমনিভাবে হাঁপিয়ে পড়ে বনহুর।

যখন নির্জনে একা বসে বসে ভাবে বনহুর তখন নিশো এসে পাশে বসে। উড়ে চলা মেঘ আর আকাশ; কখনও সমুদ্রে—এই নিয়ে চলে তাদের আনন্দ উল্লাস।

একদিন বনহুর ঘুমিয়ে ছিলো।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। কেউ তার শিয়রে বসে কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। বনহুর ইচ্ছা করেই নিশ্চুপ রইলো। ধীরে ধীরে দু'খানা ঠোঁট নেমে এলো বনহুরের কপালের উপরে।

উষ্ণ একটা নিশ্বাস।

বনহুর একটু নড়ে উঠলো।

অমনি ছুটে পালিয়ে গেলো নিশো।

❑

মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছে জাভেদ তার দলবল নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বিফল হলো জাভেদ।

নূরীর বাম হাতে একটা তীরফলক বিদ্ধ হওয়ায় সে ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছে।

জাভেদ তাই ইচ্ছা থাকলেও বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারেনি।

নূরীকে নিয়ে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

জাভেদের মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

কান্দাই আস্তানায় ফিরে এসে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

শুধু নূরীই আহত হয়নি, ওদের তিনজন অনুচরও নিহত হয়েছে।

লাশ নিয়ে এসেছে জাভেদের দল।

তবে জাম্বুরীদেরও বেশ কয়েকজনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে তারা। আশাকে উদ্ধার করতে না পেরে জাভেদ ভীষণ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে একাই পুনরায় জাম্বুরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে ব'লে মনস্থ করে নিলো।

রহমান বললো—তা মোটেই সমীচীন হবে না, কারণ এতগুলো লোক গিয়েও তাদের কাবু করা সম্ভব হলো না, আর তুমি একা গিয়ে আশাকে উদ্ধার করে আনবে?

জাভেদ বললো—হাঁ।

রহমান বললো—অসম্ভব।

কেন অসম্ভব?

তার প্রমাণ তো দেখলে জাভেদ? বললো নূরী।

নূরী শয্যায় শায়িত ছিলো, তার পাশেই কথা হচ্ছিলো রহমান আর জাভেদের।

নূরী আহত তবু সে একেবারে সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েনি। জাভেদকে বললো—রহমান যা বলেছে তা সত্য, তুমি একটা জাম্বুরীদের সঙ্গে যুদ্ধে পারবে না বরং আটকা পড়ে যাবে।

জাভেদ বললো—আমি হাঙ্গেরী কারাগার থেকে বাপুকে উদ্ধার করেছিলাম বালক বয়সে। আর এখন আমি অনেক অনেক বড় হয়েছি। একটু থেমে বললো—আশা, আম্মু বন্দী থাকবে আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকবো, এ হতে পারে না। আমাদের তিনজনকে ওরা হত্যা করেছে। আমার আম্মুকে আহত করেছে, আমি কিছুতেই ওদেরকে রেহাই দেবো না।

নূরী কাতর কণ্ঠে বলে—আমার কথা শোনো জাভেদ। ওরা বড় হিংস্র, বড় কঠিন।

আম্মু, আমিও কম নই। আমি জাম্বুরীদের জান নিয়ে তবে ছাড়বো।

নূরী এবং অন্যান্য সবাই যারা সেদিন যুদ্ধে গিয়েছিলো তারা বহু নিষেধ করা সত্ত্বেও জাভেদ অশ্ব নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লো।

কিন্তু আস্তানার বাইরে বেরিয়ে আসতেই ফুল্লরা ওর পথ আগলে দাঁড়ালো।

ডান হাতখানা প্রসারিত করে দিয়ে বললো—না, তোমাকে যেতে দেবো না।

জাভেদ বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো ফুল্লরার মুখের দিকে।

ফুল্লরা ঘাবড়ালো না, বললো—যেখানে তোমরা এতগুলো লোক গেলে তবু জিততে পারলে না, আর তুমি একা।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো জাভেদ—পথ ছাড়ো।

না।

ছাড়ো বলছি।

না, আমি পথ ছাড়বো না।

জাভেদ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ালো নূরী। বললো—ফুল্লরা, ওকে যেতে দে। আমার বারণ শুনলো না, আর তোর বারণ শুনবে?

ফুল্লরা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

চলে গেলো জাভেদ।

অশ্বপদশব্দ শোনা গেলো শুধু।

❑

নিস্তব্ধ রাত।

বনহুর এসে দাঁড়ালো খোলা ডেকে।

রাত কত তা অনুমান করে বুঝতে পারলো বনহুর—তিন অথবা চারটা হবে।

আকাশে অসংখ্য তারার মালা।

হঠাৎ মনে হলো কেউ বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো। হাল্কা পদশব্দে ফিরে তাকালো বনহুর, বললো—নিশোঁ তুমি।

কিন্তু পরমুহূর্তেই স্মরণ হলো নিশো তো তার কথা বুঝতে পারে না। কোনো জবাব তাই সে দিলো না।

বনহুর এগিয়ে এলো।

নিশো মাথা নিচু করে আছে।

বনহুর বুঝতে পারে না ওর কথা তাই কিই বা জিজ্ঞাসা করবে। নিশো যখন খুশি থাকে তখন শুধু হাসি দিয়ে বনহুরকে সম্ভাষণ জানায়। আর যখন বিষণ্ন থাকে তখন তার মনের কথা বোঝা যায় না। শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে।

বনহুর নিশোর নিকটস্থ হয়েই বুঝতে পারে সে প্রসন্ন নয়। নিশ্চয়ই ওর কিছু একটা হয়েছে।

বনহুর আলগোছে নিশোর কাঁধে হাত রাখলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিশো বনহুরের হাতের উপর মাথাটা কাৎ করে উচ্ছ্বসিতভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর নির্বাক হয়ে গেলো।

ওর কি এমন দুঃখ বা ব্যথা বনহুর জানে না। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারবে তাও পারে না। কেন নিশো কাঁদছে জানে না বা বুঝতে পারে না বনহুর।

নিশো! কথা বলো নিশো? কি হয়েছে তোমার? বনহুর ওকে বললো।

নিশো শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বনহুর ওর চিবুকটা তুলে ধরলো।

নিশো আলগোছে মাথাটা বনহুরের বুকে রাখলো। কিন্তু কয়েক মিনিট মাত্র, তারপর ঝড়ের মত চলে গেলো সে সেখান থেকে।

বনহুর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো তারপর ধীর পদক্ষেপে নিশো যে পথে চলে গেলো সেই পথে অগ্রসর হলো।

কিন্তু নিশোর ক্যাবিনের নিকট পৌঁছে দেখলো ক্যাবিনের দরজা বন্ধ।

বনহুর ফিরে এলো তার নিজের ক্যাবিনে। শয্যায় শয়ন করলো, কিন্তু ঘুম আর তার চোখে এলো না। নিশো কেন কাঁদলো, কি হয়েছে, কি তার ব্যথা। বনহুর এত দীপ্ত বুদ্ধিমান হয়েও একটা মেয়ের মনের কথা বোঝে না...

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরে ঘুম ভাঙবার পূর্বে নিশো এসে হাজির। ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো বনহুরকে—ফিরো ফিরো নিরাংও—

বনহুর চোখ মেললো।

কিন্তু নিশো কথা বললো না, শুধু তাকিয়ে রইলো বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে। নিশোকে আজ পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছ মনে হচ্ছে। কাল তবে এমন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো কেন?

কি ছিলো তার মনের কথা?

কিন্তু এর জবাব সে হয়তো কোনোদিনই পাবে না।

নিশো উচ্ছ্বসিতভাবে কিছু বললো। ইংগিতে দেখালো বাইরের দিকে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং নিশোর সংগে বেরিয়ে এলো।

ডেকে দাঁড়িয়ে নিশো আঙ্গুল দিয়ে দেখলো সম্মুখ দিকে। খুশিতে ডগমগ তার চোখ দুটো। এত খুশি তাকে দেখেনি বনহুর এ ক'দিনে। বনহুর দেখলো দূরে কালো রেখার মত নজরে পড়ছে।

বনহুর এতক্ষণে বুঝতে পারলো নিশোর আনন্দ হওয়ার কারণটা।

দূরে তীর নজরে পড়ছে।

নিশোদের ষ্টিমারখানা এবার তীরে পৌছবে সে জন্যই এত খুশি খুশি লাগছে তাকে।

বনহুর নিজেও কম খুশি হয়নি।

তীরে পৌছতে পারলে আবার সে স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে। বনহুরকে নিশো আংগুলে দিয়ে বারবার দেখিয়ে দিচ্ছিলো তীরটা।

বনহুর বললো—আমি বুঝতে পেরেছি! এজন্য আমি নিজেও আনন্দ বোধ করছি।

যদিও বনহুর জানে নিশো তার কথার একবর্ণও বুঝতে পারবে না। তবু সে বলে।

নিশো কি বুঝলো, শুধু মাথা দোলালো।

উচ্ছ্বাস নিয়ে নিশো দাঁড়িয়ে আছে।

পাশে বনহুর।

ওর বাবা এক সময় এসে দাঁড়ায়।

আজ তাকেও বেশ প্রফুল্ল মনে হচ্ছে।

বনহুর এক সপ্তাহ হলো এদের ষ্টিমারে আশ্রয় পেয়েছে। কেমন করে এরা তাকে পেলো বা উদ্ধার করলো আজও তা সে জানে না। জানার ইচ্ছা থাকলেও জানতে পারবে না বনহুর, কারণ আজ পর্যন্ত ওদের কথার একবর্ণও বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, তাই বনহুর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে।

প্রাণে যে বেঁচে আছে এবং সেই মহাতরঙ্গময় সমুদ্র গহ্বর থেকে যে উদ্ধার পেয়েছে এটাই তার বিস্ময়।

নিশো মাঝে মাঝে করতালি দিয়ে 'লাফা—লাফা' শব্দ উচ্চারণ করছিলো।

লাফা, মানেটা কি জানে না বনহুর।

তাই সে নীরব রয়েছে।

প্রতীক্ষা করছে তীরটাকে কাছে পাবার জন্যে।

❑

ঘন্টা কয়েকের মধ্যে তীর সন্নিকটে এসে গেলো।

বনহুর পকেট হাতড়ে বের করলো তার ক্ষুদে বাইনোকুলারখানা। সমুদ্রের অতলে বাইনোকুলারখানা হারিয়ে যায়নি, সে জন্য খুশি হলো বনহুর।

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে তাকালো বনহুর তীরের দিকে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সবকিছু।

নির্জন জঙ্গল।

জনপ্রাণী কিছুই নজরে পড়ছে না।

কেমন যেন মায়াপুরীর মত লাগছে জঙ্গলটা। একটা ভীতিভাব ছড়িয়ে আছে।

সম্পূর্ণ অজানা জঙ্গল।

নিশো বা তার বাবা বনহুরের কোনো কথা বুঝতে পারে না, নাহলে সব বুঝিয়ে বলতো বনহুর। এ জঙ্গলে অবতরণ করা উচিত হবে কিনা কে জানে।

বনহুর বাইনোকুলারখানা নিশোর হাতে দিয়ে দেখতে ইংগিত করলো।

নিশো বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে লাফাতে শুরু করলো, পরক্ষণেই বাইনোকুলারখানা পিতার হাতে দিয়ে বললো—লাফাংসু—লাফাংসু।

পিতা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখলো, তারপর বললো—লাফাসিংয়া হুম্ সিয়াংমো—

বনহুর বুঝলো লাফাসুং মানে দেখো দেখো আর লাফাসিংয়া মানে দেখলাম অথবা দেখেছি—

অল্পক্ষণেই তীরে পৌঁছে গেলো ষ্টিমারখানা।

ষ্টিমার থেকে নেমে পড়লো ওরা তীরে।

কতদিন পর মাটির স্পর্শ পেয়ে সবাই ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো।

নিশো তো লাফালাফি শুরু করে দিলো।

ওকে সবচেয়ে বেশি আনন্দমুখর লাগছে।

বনহুরের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো, ওর যেন কত পরিচিত লোক বনহুর।

নিশোর পিতা রাইফেল জাতীয় অস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়লো।

অন্যান্য যারা ছিলো তারাও এক একজন অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়লো। সবাই মিলে এগুলো নতুন জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

কিন্তু বেশিদূর তারা এগুতে পারলো না, হঠাৎ করে একদল অদ্ভুত মানুষ আক্রমণ করে বসলো তাদের সবাইকে।

তাদের চেহারা বিদঘুটে।

সমস্ত দেহে নানা ধরনের বিচিত্র নক্স আঁকা। লাল টকটকে চোখ, মুখে খোচা খোচা দাড়ি গোঁফ। মাথার চুলগুলো সজারু কাঁটার মত খাড়া। হাতে পাথর দিয়ে তৈরি বর্শাফলক।

একেবারে নির্জন, জনপ্রাণীহীন জঙ্গলে হঠাৎ করে এমন ধরনের অদ্ভুত মানুষের আবির্ভাব ঘটবে ভাবতেও পারেনি কেউ।

নিশো আর তার পিতা রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

বনহুর ইংগিত করলো রাইফেল নিচু করে নিতে। ওরা আক্রমণ করলেও এখনও কারও ওপর আঘাত হানেনি।

এরা যদি আঘাত হানে তাহলে হয়তো ঘটনা ভয়ংকর দাঁড়াবে। তাই বনহুর চাইলো প্রথমে সন্ধি করতে।

নিশো ও তার পিতা রাইফেল নামিয়ে নিতেই তার অন্যান্য সঙ্গিগণও রাইফেল নামিয়ে নিলো। জঙ্গলীদল ঘেরাও করে ফেলেছে তাদের।

বনহুর ওদের দলপতির দিকে হাত বাড়িয়ে বন্ধুত্ব করতে চাইলো।

দলপতিও হাত বাড়িয়ে বনহুরের সঙ্গে করমর্দন করলো।

নিশো ও তার বাবা এতে খুশি হলো।

চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে উঠলো তাদের।

বনহুরকে জংলী সর্দার কিছু জিজ্ঞাসা করলো।

বুঝতে না পারলেও বনহুর ইংগিতে বুঝিয়ে দিলো তারা বিপদে পড়েছে এবং বিপদে পড়েই এই অজানা জঙ্গলে অবতরণ করেছে।

জংলী সর্দার হয়তো কিছু অনুধাবন করে নিলো। সে সহানুভূতি জানিয়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানালো।

জংলীসর্দারের মহত্ত্ব মুগ্ধ করলো বনহুরকে।

বনহুর নিশো ও তার পিতাকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ইংগিতে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু নিশোর বাবা কিছুতেই জংলীদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ওদের ভীষণ চেহারা দেখে নিশো ও তার বাবা খুব ভয় পেয়ে গেছে।

বিশেষ করে জংলী সর্দার নিশোর দিকে বারবার লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিলো।

অবশ্য বনহুর নিজেও এটা লক্ষ্য করেছে।

তবু ওরা বাধ্য হলো জংলীসর্দারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে।

জংলী সর্দার দলবল নিয়ে তাদের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

নিশো কিন্তু বারবার ভীত দৃষ্টি নিয়ে বনহুরের দিকে তাকাচ্ছিলো। কখনও বা পিতার হাতখানা জড়িয়ে ধরছিলো মজবুত করে।

না জানি কোন্ বিপদ আবার ঘনিয়ে আসছে কে জানে।

বনহুর নিশো ও তার দলবল সহ জঙ্গলী সর্দারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার সঙ্গে চললো।

সত্যি আশ্চর্য জঙ্গল বটে।

এতটা পথ তারা জঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে কিন্তু একটা বন্য জীবজন্তুও তার নজরে পড়লো না।

গোটা জঙ্গল জুড়ে যেন ঐ জংলীদল বিরাজমান।

একসময় তারা বেশ একটা ফাঁকামত জায়গায় এসে পৌঁছে।

বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়েছে।

বনহুর বুঝতে পারলো জংলীসর্দারের বাড়ি এটা আর গোটা জঙ্গলটা তার রাজ্য।

জংলীরা যারা তাদের ঘেরাও করে নিয়ে এলো তারা ছাড়াও আরও জংলী নরনারী সেখানে জামায়েত ছিলো।

সর্দার ও দলবল আসতেই জংলদিল অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো।

সর্দার কাঠের তৈরি মঞ্চের উপর উঠে গেলো।

বনহুর ও নিশোকে উপরে উঠে যাওয়ার জন্য ইংগিত করলো সে।

বনহুর একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলো তার ক্ষুদে পিস্তলখানা ঠিক আছে কিনা। এসব বনহুরের প্যান্টের গোপন পকেটে থাকতো। এগুলো তার বিপদ মুহূর্তের সাথী। অতি সাবধানে এগুলো রক্ষিত ছিলো, তাই সমুদ্রের ভয়ংকর তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েও এগুলো তার সঙ্গছাড়া হয়নি।

বনহুর নিশোর ডান হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে কাঠের তৈরি উঁচু মঞ্চের উপরে উঠে গেলো।

নিশোর পিতা দলবল নিয়ে বসলো নিচে কাঠের তৈরি মাচাঙ্গের উপর।

সর্দারের নির্দেশে শুরু হলো নাচগান।

সে কি উৎকট গানের সুর।

ক'জন পুরুষ ঢাক বাজাতে শুরু করলো। আর ক'জন নারী নাচতে লাগলো।

জংলী নারীদের দেহে এক টুকরো চামড়ার আবরণ ছাড়া আর কোনো আবরণ ছিলো না।

ধেই ধেই করে নাচছে ওরা আর ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান গাইছে।

এলো খানাপিনা!

কিছু কাঁচা মাংস আর নরমুন্ড ভর্তি কোনো নেশাকর গাছের রস।

বনহুর নিজের দলবলকে লক্ষ্য করে ইংগিতে নিষেধ করে দিলো তারা যেন এসব না খায়। নিশো বনহুরের ইংগিত বুঝে নিলো, সে ঐ সব খাদ্য গ্রহণ করলো না।

এমন কি অন্যান্য সঙ্গীও খেলো না।

সর্দার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

তাদের দেওয়া খাদ্যসম্ভার না খাওয়ার সর্দার রাগতভাবে কিছু ইশ্চারণ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে জংলীরা নাচগান বন্ধ করে দিলো এবং মুহূর্তে ঘেরাও করে ফেললো তাদের সবাইকে।

❑

জাভেদ অশ্ব নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো জাম্বুরীদের আস্তানায়। জাম্বুরীরা আশাকে একটা গাছের গোড়ালির সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে তাকে আগুনে পুলিয়ে মারবার আয়োজন করেছে।

তাদের কয়েকজন অনুচরকে ওরা হত্যা করেছে, এ কারণে তারা হত্যা করবে আশাকে। জাভেদকেও জাম্বুরীরা পাকড়াও করে এনেছিলো কিন্তু আটকে রাখতে পারেনি, সে সব বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে পালাতে সক্ষম হয়েছে। তারপর দলবল নিয়ে এসে তাদের সাথে যুদ্ধও করেছে।

জাভেদ সহসা আক্রমণ করে বসেছে জাম্বুরীদের। তারা জানতো না হঠাৎ রাতের অন্ধকারে কেউ তাদের এভাবে আক্রমণ করবে। জাভেদ রাইফেল নিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে আছে তীরধনু।

আশাকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে চারপাশে শুকনো কাঠ স্তূপাকার করে অগ্নি সংযোগ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাভেদ তাদের আক্রমণ করে বসেছে।

চালালো সে গুলীর পর গুলী।

অন্ধকারে আর্তনাদে ভরে উঠলো গভীর জঙ্গল।

ততক্ষণে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আশার চারপাশে স্তূপাকার শুকনো কাঠগুলো। অন্ধকার লেলিহান অগ্নিশিখায় আলোময় হয়ে উঠে।

জাভেদের গুলী গিয়ে বিদ্ধ হয় এক একজন জাম্বুরীর বুকে। তীব্র আর্তনাদ আর লেলিহান অগ্নিশিখার দীপ্ত আলো গভীর জংলীটার নিস্তব্ধতা এক নিমিশে উধাও করে দিলো।

সেকি ভীষণ এক তান্ডবলীলা!

জাভেদ হন্য হয়ে উঠেছে। সে তার অশ্ব হাম্বুকে নিয়ে ক্ষিপ্তের মত গুলী ছুড়ছে।

জাম্বুরীরাও সজাগ হয়ে উঠলো, তারাও পাথর নির্মিত অস্ত্রনিক্ষেপ করে চললো ভীষণভাবে।

কিন্তু জাভেদ অত্যন্ত দ্রুত কাজ করছিলো, তার লক্ষ্য তার আশা আম্মুকে উদ্ধার করা। জাভেদ একাই তার রাইফেলের গুলীতে জর্জরিত করে ফেললো জাম্বুরীদের।

জাম্বুরীরা যখন জাভেদের গুলীর আঘাতে দিশেহারা হয়ে পড়লো এবং বিচ্ছিন্নভাবে পালাতে লাগলো এদিক ওদিকে তখন জাভেদ তার অশ্ব হাম্বুর পৃষ্ঠদেশ থেকে দ্রুত অবতরণ করে অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বাকে পরিহার করে আশাকে গাছের গুঁড়ি থেকে মুক্ত করে নিলো এবং তুলো নিলো অশ্বপৃষ্ঠে।

আশা সংজ্ঞাহারার মত হয়ে পড়েছিলো। জাভেদ যে তাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়েছে তার সে জানতে পারলো না।

জাভেদ দুর্ধর্ষ জাম্বুরীদের ভয়ংকর বাধার প্রাচীর ভেঙে আশাকে উদ্ধার করে আনলো। কিন্তু আশার দেহে বহু স্থানে অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় সে কাহিল হয়ে পড়েছিলো।

জাভেদ হাম্বুর পিঠে তাকে ধরে রাখলো অত্যন্ত শক্ত করে।

হাম্বু দুর্ধর্ষ অশ্ব।

তার চেহারার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য ছিলো না। চোখগুলো বড় বড় ছিলো, দাঁতগুলো অন্যান্য অশ্বের তুলনায় বড় ছিলো। কাঁধে বা ঘাড়ে তার কোনো কেশর বা চুল ছিল না। দেহ ছিলো অস্বাভাবিক উঁচু এবং মোটা। তেমনি ছিলো হাম্বুর রাগ। জাভেদ ছোটবেলা হাতেই হাম্বুর ভক্ত ছিলো। হাম্বু ও জাভেদকে পছন্দ করতো অন্যান্য সবার চেয়ে বেশি।

হাম্বুর জন্ম বনহুরের আস্তানার অশ্বশালায়।

জন্মবার পর হাম্বুর চেহারা অন্যান্য অশ্বশাবকের চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের হয়ে ছিলো। তাই ওকে অনুচরগণ কেউ তেমন ভাল চোখে দেখতো না। বড় দুর্ধর্ষ ছিলো হাম্বু, তাই ওর কাছে কেউ যেতে সাহস পেতো না।

হাম্বুকে জাভেদ শুধু আয়ত্তে আনতে পেরেছিলো তাই হাম্বু জাভেদের প্রিয়।

হাম্বুর পিঠে আশাকে তুলে নিয়ে ফিরে এলো জাভেদ কান্দাই আস্তানায়।

নূরী এবং নাসরিন আশার এ অবস্থা দেখে ভীষণ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হলো। নূরী ব্যস্তসমস্ত হয়ে আশাকে নিয়ে নিজ গুহায় শুইয়ে দিয়ে সেবাযত্ন করতে লাগলো।

নাসরিন তাকে সহায়তা করে চললো।

নূরী আশাকে প্রীতির চোখে দেখতো, কারণ সে একবার নয় বহুবার বনহুরকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছে। বনহুর নূরীর জীবন সাথী। তার জীবনের চেয়ে প্রিয় বনহুর তাই আশার ঋণ সে কোনো দিন ভুলবে না বা ভুলতে পারে না।

নূরী জানতো আশা বনহুরকে ভালবাসে এবং তার সান্নিধ্য পাবার জন্য সে ব্যাকুল। নূরীর নারীমন মাঝে মাঝে আশার এই দুরাশাকে নিয়ে ক্ষুব্ধ হতো, রাগান্বিত হতো তার হুরকে কেন সে কামনা করে কিন্তু যখন সে বুঝলো আশা তাকে না পেলেও ভালবেসে যাবে বিনা স্বার্থে...

সংজ্ঞাহীন আশার শিয়রে বসে ভাবছিলো নূরী অনেক কথা যা তার জীবনকে বহুবার নাড়া দিয়েছিলো। আশাকে সে যদি স্বীকৃতি না দিতো তাহলে নিজ পুত্র জাভেদকে তুলে দিতো না আশার হাতে। আশা যেন জাভেদকে পুত্র হিসেবে পেয়ে বনহুরকে ভুলে যায় এই হলো নূরীর মনের কথা।

আশার সংজ্ঞা ফিরে এলো এক সময়।

স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সে জীবিত না মৃত। কারণ যখন তার চারপাশে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিলো, অসহ্য যন্ত্রণায় দেহটা তার ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো তখন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো সে!

এখন সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সে আঁচ করলো কেউ বসে আছে তার শিয়রে। কে সেই ব্যক্তি যার এত দয়া? তবে কি জাভেদ জাভেদ তাকে উদ্ধার করে এনেছে কিন্তু তা কি করে সম্ভব হবে? এতগুলো ভয়ংকর জাম্বুরীর সঙ্গে সে একা পেরে উঠবে কি করে? তবে কে?

আশা চোখ মেলে তাকালো। পরক্ষণেই আশা চিৎকার করে ওঠে— একি! আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কে তুমি আমার শিয়রে, আমার কাছে এসো।

নূরী চমকে উঠলো আশা বলে কি, সে কি তবে অন্ধ হয়ে গেছে। বললো নূরী—আশা বোন, আমি নূরী—তোমার জাভেদের আম্মু।

তুমি নূরী!

হাঁ।

কিন্তু কিন্তু আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব অন্ধকার। আমি আমি অন্ধ হয়ে গেছি নূরী। আমার জাভেদ কই? সে তো ভাল আছে?

হাঁ জাভেদ, ভাল আছে। এতক্ষণ সে তোমার পাশে ছিলো, এখন সে পাশের গুহায় বিশ্রামের জন্য গেছে।

আমি এখন বুঝতে পারছি আমার জাভেদই আমাকে জাম্বুরীদের কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

হাঁ বোন, তোমার কথা সত্যি।

আমি জানি জাভেদ যদি আমাকে উদ্ধার করে না আনতো তা হলে আমার এ দেহটা কখন ছাই ভস্মে পরিণত হতো! আমার পাশে লেলিহান অগ্নিশিখা যেভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিলো তাতে আমার জীবিত থাকার কথা নয়।

বোন আশা, তুমি এখন ঘুমাও, সব পরে শুনবো।

না, আমি আর ঘুমাতে চাই না। আমি চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমি তোমাকে দেখতে পাবো না, দেখতে পাবো না আমার জাভেদকে—ফুপিয়ে কেঁদে উঠে আশা।

নূরী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—তোমার কিছু হয়নি, তুমি ভাল হয়ে যাবে।

না না, আমি ভাল হবো না। আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিও না। আমি চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে গেছি। জাভেদ, ওরে আমার জাভেদ, কোথায় তুই—

পাশের গুহা থেকে জাভেদ শুনতে পায় আশার আর্তকণ্ঠস্বর। ছুটে আসে সে আশার পাশে—আশা আম্মু, এই যে আমি...জাভেদ আশার পাশে বসে মুঠায় হাতখানা চেপে ধরে।

আশা তেমনি আর্তকণ্ঠে বলে...না না, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। জাভেদ তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না—আমি অন্ধ হয়ে গেছি।

তুমি অন্ধ হয়ে গেছো! এ তুমি কি বলছো আশা আম্মু?

হাঁ, তোমার আশা আম্মু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কথাটা বললো নূরী।

জাভেদ তাকালো নূরীর মুখের দিকে।

একটা শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারলো না, তার কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আশার মুখটা তুলে ধরলো নিজের মুখের কাছে।

জাভেদ ভাল করে তাকালো আশার চোখ দুটোর দিকে।

জাম্বুরীদের নিষ্ঠুর অগ্নিশিখা আশার চোখ দুটির দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে নিয়েছে। জাভেদ বলে উঠলো—আম্মু, তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার জন্য

দায়ী আমি। আমি যদি সেদিন জাম্বুরীদের একজনকে হত্যা না করতাম তাহলে তারা তোমার প্রতি এ আচরণ করতো না। জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

এ তুই কি বলছিস জাভেদ। দৃষ্টিশক্তিই শুধু নয়, আমার জীবন আমি বিলিয়ে দিতাম তোর মঙ্গলের জন্য। জাভেদ, তুই আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিস্। এ কথা আমি কোনো দিন ভুলবো না। তুই আমার সন্তান...

নূরী বলে উঠলো—সন্তান হয়ে মাকে উদ্ধার করেছে শত্রুর কবল থেকে এটা আর এমন কি করেছে? ওর কর্তব্য পালন করেছে এই যা।

আশা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আমি যে এখন তোমাদের বোঝা হয়ে রইলাম বোন নূরী।

ছিঃ! ও কথা বলো না আশা। তোমার কাছে আমরা চিরঋণী। তুমি আমার হুরের জীবন রক্ষা করেছো একবার নয় কয়েকবার। তুমি আমাদের কাছে কোনোদিনই অযত্ন পাবে না। আগে সুস্থ হয়ে নাও। এখন তুমি অত্যন্ত অসুস্থ বোন আশা।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুধারা।

তার মনের আকাশে একটা মুখ ভেসে উঠছিলো—বনহুরের মুখখানা। আশা আর কোনোদিন তার দৃষ্টি দিয়ে বনহুরকে দেখতে পাবে না, সেটাই হলো তার সীমাহীন দুঃখ।

আশা সম্মুখে হাত বাড়ালো—জাভেদ, ওরে তুই কোথায়?

এই তো আমি তোমার পাশে। জাভেদ আশার হাত দু'খানা মুঠায় ধরে ফেললো।

আশা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—আমি আর কোনোদিন তোর মুখ দেখতে পাবো না এটাই আমার বড় দুঃখ। এ দুঃখ আমি কোথায় রাখবো বল্।

জাভেদ বলে—আশা আম্মু, তুমি ভেবো না, আমি যেমন করে হোক তোমাকে সুস্থ করে তুলবো, তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবোই।

পারবি! ওরে পারবি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে? বললো আশা।

কেন পারবে না বোন। পৃথিবীতে অনেক কিছুই হয় যা অসম্ভব। তোমার দৃষ্টিশক্তিও আবার ফিরে পাবে। নূরী কথাগুলো বলে আশার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

আশা ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলো।

এমন সময় ফুল্লরা এলো সেখানে।

নূরী বললো—ফুল্লরা, তোমরা এখানে বসো। আমি ওর পথ্য নিয়ে আসি।

ফুল্লরা বললো—যাও।

নূরী বেরিয়ে গেলো।

ফুল্লরা আশার ললাটে হাত রেখে বললো—কেমন আছো আশা আম্মু?

আশা কোনো জবাব দিলো না তার গন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

জাভেদ আর ফুল্লরা তাকালো উভয়ের মুখের দিকে।

পরবর্তী বই

দস্যু বনহুর ও নিশো